সুশীল রায়, সম্পাদক

গোপাল ভৌমিক, সহঃ-সম্পাদক ধীরেন ঘোষ, পরিচালক

ত্রয়োদশ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৪৮ { দ্বিতীয় সংখ্যা

নিয়মাবলী

১। মাঘ মাস থেকে নাচঘরের বর্ষারম্ভ ;
২। প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহে নাচঘর প্রকাশিত হয় ;
৩। প্রতি সংখ্যার নগদ দাম চার আনা, বার্ষিক সডাক তিন টাকা চার আনা ;
৪। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, সমাজ, ধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ এবং মৌলিক ও অনুবাদ গল্প উপন্যাস একাঙ্ক-নাটক কবিতা প্রভৃতি রচনা নাচঘরে সাগ্রহে গৃহীত হয় ;
৫। উপযুক্ত ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয় ;
৬। রচনাদি সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা প্রতি বারে ৩০৲
" অর্ধ " " " ১৬৲
" সিকি " " " ৯৲

কভার বিশেষস্থান ও রঙীন বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখে জানুন।

ভারতের বিভিন্ন অংশে নাচঘর বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট আবশ্যক।

পরিচালক, **নাচঘর**

কার্যালয়ঃ

৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টেলিফোন : কলিকাতা ৩১৪৫
টেলিগ্রাম : রিদম্‌স্‌ (Rhythms)

সূচীপত্র

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

দুটি কথা

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ছেষট্টি বছর আগে "বঙ্গ দর্শনে"র প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় "পত্র সূচনা" শীর্ষক মুখবন্ধে সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র যে কথাগুলি বলেছিলেন তার থেকে দুএকটা উদ্ধৃত করে আপনাদের শোনাই।—

(১) "ইংরাজী-প্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থিরজ্ঞান আছে যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাংলা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গলাভাষায় লেখক মাত্রেই হয়ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপি-কৌশল-শূন্য; নয়ত ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গলা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয়ত অপাঠ্য, নয়ত কোন ইংরাজী গ্রন্থের ছায়ামাত্র; ইংরাজীতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গলায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি?"

(২) "আমরা কখনো দেখি নাই যে, যেখানে উভয়পক্ষ ইংরাজীর কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরাজীতে পঠিত হইবে।"

(৩) "যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা ভাষায় আপনার উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালির উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।"

(৪) "এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে এডুকেশন 'ফিল্টার ডাউন' করিবে। একথার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলেই হইল, অধঃশ্রেণীর লোকদের পৃথক শিখাইবার প্রয়োজন নাই; তাহারা কাজে কাজেই বিদ্বান হইয়া উঠিবে। যেমন শোষক পদার্থের উপরিভাগে জল সেক করিলেই নিম্নস্তর পর্য্যন্ত সিক্ত হয়, তেমনি বিদ্যারূপ জল, বাঙ্গালী জাতিরূপ শোষক মৃত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে, নিম্নস্তর হঠাৎ ইতর লোক পর্য্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে।"

(৫) "প্রধান কথা এই যে, এক্ষণে আমাদিগের ভিতর উচ্চশ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা মূর্খ দরিদ্র লোকদের দুঃখে দুঃখিত নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা ধনবান্ এবং কৃতবিদ্যদের কোনো

সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। * * * এরূপ কখনো কোনো দেশে হয় নাই, যে ইতর লোক চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, ভদ্রলোকদের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বরং যে যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে সেই সেই সমাজের উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত ও সহৃদয়তাসম্পন্ন।"

(৬) "প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণগত পার্থক্য। এই বর্ণগত পার্থক্যের কারণ, উচ্চবর্ণ এবং নীচবর্ণে যেরূপ গুরুতর ভেদ জন্মিয়াছিল, এমন কোনো দেশে জন্মে নাই, এত অনিষ্টও কোনো দেশে হয় নাই।"

(৭) "যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সম্বর্দ্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব।"

এই ছেষট্টি বছর ইংরাজি শিক্ষার বিস্তার নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই চলেছে। বি, এ বঙ্কিমের পরে কত সহস্র বি, এ বাঙ্গালিতে বাংলা দেশ ছেয়ে গেছে তার গণনা সুসাধ্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় শিক্ষিত বাঙ্গালীর মাতৃভাষা সম্বন্ধে যে অনাস্থা বা অবহেলা ছিল তার পরিবর্ত্তন কতখানি হয়েছে সে সম্বন্ধে এইটুকু অসঙ্কোচে বলা যায়—"The little done and the undone one vast"; যতটা উন্নতি হওয়া উচিত ছিল তার তুলনায় যতটকু হয়েছে তা অকিঞ্চিৎকর। এ সম্বন্ধে তথ্য নির্ণয় করতে হলে দুটি জিনিষ মনে রাখতে হবে—quality and quantity, গুণ বা কৌলিন্য এবং পরিমাণ বা সংখ্যা। রবীন্দ্র-সাহিত্যকে বাদ দিলে গত অর্দ্ধ শতাব্দীতে উচ্চাঙ্গের সৎসাহিত্য ঔৎকৃষ্টে ও পরিমাণে বেশী নয়। যথার্থ প্রতিভাশালী লেখকের সংখ্যা আজ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে কম। কেন এত কম সেটা ভাববার কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের এই শত বার্ষিকীতে শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই তাঁর এই মন্তব্যগুলি স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে যে বিষম ব্যবধানের কথা তিনি বলেছেন আজও তা নিরাকৃত হয়নি। একদিকে গণশিক্ষার বিরলতা, অন্যদিকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আর্থিক স্বাচ্ছল্যের সঙ্গে অতিরিক্ত পরিমাণে পাশ্চাত্যপ্রভাবসম্ভূত সাজ সজ্জা ও উপকরণ বহুল গার্হস্থ্যাশ্রমের বৈশিষ্ট্যে ধনী দরিদ্রের পার্থক্য বঙ্কিমযুগের চেয়েও বোধ করি এখন আরও প্রবল। আমরা অনেকটা 'ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ' হয়ে পড়েছি, সংস্কৃতির হিসাবে। প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের উপর যে পুনর্গঠনের সূত্রপাত হয়েছে তাতে হিন্দু সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি একদিকে যেমন হারাতে বসেছি, অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জাগত প্রাণশক্তি, দুঃসাহস, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও সমবায় বুদ্ধি অর্জ্জন করতে পারি নি। বর্ণগত

ভেদবিচারের যে অনিষ্টকর বিচ্ছিন্নতার কথা বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন, শিক্ষিত হিন্দু-সমাজের সমবেত চেষ্টায় তার নিরাকরণ কতটুকু হয়েছে ?

বঙ্কিমচন্দ্রের এই শতবার্ষিকীতে আমরা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে সমবেত হয়েছি। এরূপ অনুষ্ঠানের দায়িত্ব আছে। উচ্চ আদর্শ ও সাধনা তাঁর সাহিত্যিক জীবনকে অনুপ্রাণিত করেছিল। আমাদের শ্রদ্ধার নিবেদন তবেই সত্য হবে, যদি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর কল্যাণব্রতে ব্রতী হবার সঙ্কল্প জাগে। দায়িত্বের গুরুভার যখন বুকের থেকে ঝেড়ে ফেলি, তখন বড় বড় কথা বড় সহজে মুখে আসে। বাক্য-জলজানে স্ফীত ব্যোমযানে চড়ে মেঘলোকে উধাও হওয়া যাদের পেশা, তাদের ঊর্দ্ধগতিকে ক্ষিপ্রতর করবার একটা পদ্ধতি হচ্চে, বেলুনে বোঝাই করা বালির বস্তা ফেলে ফেলে হাল্কা হওয়া। যে পরিমাণে কথার অনুযায়ী কাজ করবার বাধ্যতা মন থেকে চলে যায়, সেই অনুপাতে বক্তৃতার মাত্রা বাড়িয়ে চলা সহজ হয়। বঙ্গদর্শনের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র যে শৃঙ্গধ্বনি তুলেছিলেন, তার সুগভীর সুগম্ভীর আহ্বান আমাদের কর্ম্মোদ্যমে উদ্বুদ্ধ করুক।

আর একটি কথা বলে আমার বক্তব্য আজ শেষ করব। সেটি হচ্চে সমালোচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা ও আভিজনিন ভদ্রতা। বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় বর্ষের আষাঢ় সংখ্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বহু বিবাহ" গ্রন্থটির একটি দীর্ঘ সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা। তারানাথ তর্কবাচস্পতির রূঢ় প্রতিবাদে ঈশ্বরচন্দ্রের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়েছিল এবং এই গ্রন্থে ক্রুদ্ধ বিদ্যাসাগরের লেখনীতে যে কটূক্তি উদ্গীরিত হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র সে ত্রুটি কিরূপ ভদ্রোচিত ভাষায় প্রদর্শন করেছেন, সমালোচনা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধটি আদর্শস্বরূপ হয়ে থাকবে। যুক্তিবিচারের নৈপুণ্যেও এ লেখাটি বিশেষ উপভোগ্য। কিন্তু সবচেয়ে যে কথাটি বঙ্কিমচন্দ্র চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, সেটি হচ্চে, শিষ্টতা ও শ্লীলতা সর্বদা এবং সর্বথা অলঙ্ঘনীয়। সাহিত্যিক বিচারক বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাসে ঋষিতুল্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসংযত বাক্য বিনা কসুরে অব্যাহতি পায় নি। জজের আলখাল্লা উন্মোচন করে বঙ্কিমচন্দ্র এই বলে সমালোচনাটি শেষ করেছেন।—

"উপসংহার কালে আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তিনি বিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, দেশহিতৈষী এবং সুলেখক। ইহা আমরা বিস্মৃত হই নাই। বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট অনেক ঋণে বদ্ধ। এ কথা যদি আমরা বিস্মৃত হই, তবে আমরা কৃতঘ্ন। আমরা যাহা লিখিয়াছি তাহা কর্ত্তব্যানুরোধেই লিখিয়াছি।"

বঙ্কিমপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সলজ্জ দ্রুত পলায়নের একটি চলচ্চিত্র

এঁকেছেন এমন একটি সভাক্ষেত্র হ'তে, যেখানে ব্যক্তি বিশেষের কোনো আদিরসাত্মক শ্লোকের আবৃত্তিতে শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সুরসিক ছিলেন, নাসা-ভ্রু-কুঞ্চিত মূর্ত্তি শুচিবায়ুগ্রস্ত রুচিবাগিশ যে ছিলেন না, একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু প্রকৃত ভদ্রের সহজ সৌজন্য তাঁর ছিল, তাই ইতরতার প্রতি ছিলেন খড়গহস্ত।

আজকালকার কোনো কোনো সাহিত্যিক আসরে উপস্থিত থাকতে হলে কতবার যে তাঁকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হত সে কথা মনে হয়। তাঁর পবিত্র স্মৃতি-বাসরে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রটি নিষ্কলুষ নিষ্কণ্টক করবার সঙ্কল্পে বঙ্কিমচন্দ্রের যথার্থ ভক্ত যাঁরা তাঁরা বদ্ধ পরিকর হোন।

বাণীসঙ্ঘের অনুষ্ঠিত বঙ্কিম-জন্ম-শতবার্ষিকীতে পঠিত।
(২৮শে শ্রাবণ ১৩৪৫)

শ্রীশ্রীদোললীলা

অশোকনাথ শাস্ত্রী

হিমঋতুর তুষারশীতল শক্তিহর স্পর্শে বিশ্বপ্রকৃতি তাঁহার সকল চাঞ্চল্য হারাইয়া যেন তন্দ্রামগ্ন হইয়া পড়েন। ক্রমশঃ ঋতুরাজের শুভাগমন সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃতিদেবীরও সুপ্তিভঙ্গের লক্ষণ দেখা দেয়। সারা শীতকাল প্রালেয়-পবন যে বাহ্য প্রকৃতিকে প্রাণহীন ও আন্তরপ্রকৃতিকে মূক করিয়া রাখিয়াছিল, বসন্ত-সঞ্চারের প্রাক্কালে মলয় সমীরণ নব-কিসলয়োদ্গমে সেই বিশুষ্কা বহিঃপ্রকৃতির নীরসতা দূর করিয়া তাঁহাকে প্রাণময়ী করিয়া তুলে, ও সেই সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতিরও জড়তা হরণ করিয়া তাঁহাকে বাণীবন্দনায় মুখর করিয়া তুলিতে চায়। বুঝি এই কারণেই—আন্তর ও বাহ্য প্রকৃতির মৌন-ম্লান মুখে ভাষা ও হাসি ফুটাইবার উদ্দেশ্যে শিশির-বসন্তের এই অপরূপ সন্ধিক্ষণে বাগ্দেবীর অর্চ্চনার আয়োজন।

বাসন্তী পঞ্চমীতে যে বসন্ত ঋতুর প্রথম আবির্ভাব, তাহারই ক্রমবিকাশের তিনটি বিভিন্ন স্তর তিনটি বিশিষ্ট উৎসবের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। শ্রীশ্রীপঞ্চমীর বাসন্তী রঙের মৃদুল স্পর্শে ঈষদ্ভিন্ন হিমনিষিক্ত শুভ্র পুণ্য প্রভাতে বাগ্দেবতার উপাসনায় যে মধু ঋতুর প্রথম আবাহন, শ্রীশ্রীদোলযাত্রার ফল্গুরাগরঞ্জিত প্রদীপ্ত রবিকরোজ্জ্বল মধ্যন্দিনে তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা, আর শ্রীশ্রীমহারাসরজনীর কৌমুদীপ্লাবিত স্নিগ্ধমদির নিশামুখে বিসর্জ্জনের পরিকল্পনা। মাঘের পূর্ব্বাহ্ণে বসন্তশ্রীর উদ্বোধন, ফাল্গুনের মধ্যাহ্নে তাহার চরম প্রকাশ ও চৈত্রের সায়াহ্নে উহার বিদায়ের সুর রণিত হইতে থাকে।

দোলযাত্রাই বসন্তোৎসবের মধ্য-যৌবন। শ্রীপঞ্চমীর অরুণোদয়ে ঋতুরাজ যখন প্রথম দেখা দেন, তখনও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিলয়ভূয়িষ্ঠ শিশিরের জড়িমায় আবেষ্টিত। দোলোৎসবের দিবা দ্বিপ্রহরে সে জড়িমা-সঙ্কোচের লেশমাত্রও থাকে না। অথচ রাসযামিনীর আবেশবিভোর শিথিল মধুরিমাও তখন পর্য্যন্ত তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। দোললীলার মাধবী শ্রী ব্রীড়াসঙ্কুচিতা নবোঢ়া মুগ্ধা বালাও নহে, প্রিয়প্রেমপরিতৃপ্ত প্রৌঢ়া প্রগল্ভা গৃহিণীও নহে—এ যেন কান্ত-মিলনাতৃপ্ত ধীরা ধীরা মধ্যা নায়িকা। ইহাতে উদ্দামতা আছে, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতার অভাব। সুগন্ধি আবির-রাগের মতই উহা নিবিড় অনুরাগের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে ভরপুর, কিন্তু পূতিগন্ধি কর্দ্দমের আবিলতা উহাতে নাই। ইহাতে আকুলতা আছে, কিন্তু তাহা চাপল্যহীন। ছন্দে-গানে-নৃত্যে ইহার উন্মেষ, হৃদয়ের বিনিময়ে ইহার ক্রমবিকাশ, আর অনুরাগের প্রতিষ্ঠায় ইহার পূর্ণ পরিণতি।

এই দোললীলার পৌরাণিক ইতিহাস অতি প্রাচীন। কিন্তু পুরাণসম্মত প্রমাণ যাঁহাদিগের নিকট নির্ভরযোগ্য নহে, তাঁহারাও এ উৎসবের প্রাচীনতা একেবারে উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। মহর্ষি বাৎস্যায়নের কামসূত্রে 'হোলাকা' নামক যে ক্রীড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা এই দোলযাত্রারই রূপান্তর। এই হোলাকাই বর্ত্তমানের 'হোলি' বা 'হোরি'র রূপ ধারণ করিয়াছে।

বসন্তোৎসবের সময় যে আবির ব্যবহারের প্রথা আছে, উহাও বিশেষ প্রাচীন। রাজাধিরাজ শ্রীহর্ষ তাঁহার রত্নাবলী নাটিকার প্রথমাঙ্কে যে মদনোৎসবের মনোরম চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতেও দেখা যায় যে পটবাস-চূর্ণের উৎক্ষেপে রাজধানী কৌশাম্বীর আকাশ-বাতাস-নগরপথ অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীহর্ষ হিন্দু ছিলেন কি বৌদ্ধ—এ বিচার লইয়াই যাঁহারা আত্মহারা হইয়া আছেন, তাঁহারাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবল প্রভাব সত্বেও উত্তর ভারতের প্রজামণ্ডলী উদ্দাম ফল্গুক্রীড়ায় মাতিবার অভ্যাস ছাড়িতে পারেন নাই। শুধু তাহাই নহে—এ উৎসবের জের আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাটের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত স্পর্শ করিত, ও উহা তাঁহার সানন্দ অনুমোদনে স্নিগ্ধ সরস রূপ পরিগ্রহ করিয়া অবাধ গতিতে অগ্রসর হইত।

হোলি উত্তর ভারতেরই নিজস্ব উৎসব। কবে কোন্ অজ্ঞাতপ্রায় যুগে ভরা বসন্তের মধ্য দিনে ব্রজমণ্ডলের তরুণ তরুণীগণ মিলিয়া কালিন্দী পুলিনে মঞ্জরিত সহকারশাখায় কুসুমশোভিত দোল্না ঝুলাইয়া তাহাতে চির-কিশোর-কিশোরীকে মোহন ভঙ্গীতে দোলাইতে দোলাইতে আবিরের পিচ্‌কারী দিয়া উভয়কে লালে লাল করিয়া দিয়াছিলেন, ঋতুরাজ আজিও সে অনাবিল মধুর দৃশ্য বুঝি ভুলিতে পারেন নাই; সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে সে অনুপম সৌন্দর্য্যের ছবি অন্তরপটে আঁকিয়া রাখিয়াছেন। বর্ষে বর্ষে ঋতুচক্রের আবর্ত্তনে যখনই বসন্তের আবির্ভাব ঘটে, তখনই সেই দৃশ্যের পুনরভিনয়দর্শনের আশায় ঋতুরাজ প্রতি কিশোর-কিশোরীর প্রাণে দোলা দিতে থাকেন। যাঁহারা অন্তরে অন্তরে সে দোলা অনুভব করিবার সামর্থ্য দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার নিষ্ঠুর নিষ্পীড়নেও হারাইয়া ফেলেন নাই, দোললীলার আনন্দ-উৎসবে কেবল তাঁহারাই মাতিয়া উঠেন; শ্রীনন্দনন্দনের নিত্যলীলার অনুসরণে অনুরাগের মূর্ত্ত-প্রতীক আবির কুঙ্কুম উড়াইয়া পরস্পরের চিত্তে স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসার মঙ্গল-গ্রন্থি দৃঢ়তররূপে বন্ধন করেন। এইরূপে বৎসরান্তে হোলির পুণ্য-উৎসবের মধ্য দিয়া সেই চিরসুন্দর ব্রজমোহন-মোহিনীর অপ্রাকৃত শাশ্বত প্রেমের অভিনব অঙ্গরাগ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

মাৎ

তারাপদ রাহা

প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা।

শ্রীকোলে অবশ্য তখন পোষ্টাফিস হইয়াছে, বুধবার শনিবারে হাট বসে, মাঝারি ধরণের একটি পাঠশালাও আছে—সুতরাং মাগুরা ও ঝিনাইদহ পর্য্যন্ত পাঁচ সাত ক্রোশের লোকজন এ গ্রামের নাম জানিবে—তাহাতে আর বিচিত্র কি? পাশের গ্রাম বারুইপাড়ায় না আছে পোষ্টাফিস, না হাট, না আর কিছু—তবু প্রসিদ্ধিতে সে শ্রীকোলকে হারাইয়া দিয়াছে। মাগুরা বা ঝিনাইদহ ছাড়াইয়া গেলে অনেকেই হয়ত শ্রীকোল চিনিবে না, কিন্তু বারুইপাড়া চিনিবে।

বাড়ী কোথায়?

শ্রীকোলে।

বারোইপাড়ার কোন দিকে?

যে চেনে সে-ত বারুইপাড়ার নামটা ওর সঙ্গে যোগ করিয়া দেয়: ওঃ বারোইপাড়া-শ্রীকোল?

বারোইপাড়া চেনো তুমি?

চিনি—নে?—বারোইপাড়ার নাম কেডা না জানে?—সেবার যে মেলা বসিছিলো, ঠাকুর বেরুইছিলেন—সেহানে, কতলোক দোড়ুইছিল না? হা, হা,—বাবু বারোইপাড়া কি ভোলবার?......জাল দলিলের দরকার হ'লিই বারোইপাড়া, নাম করবো না তেনার,—অন্ন জোট্‌বে না।

কথাগুলি মিথ্যা নয়। তিনজন লোকই বারুইপাড়াকে প্রসিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। আজ তাঁহারা তিনজনই স্বর্গে,—তাই এই কাহিনী ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করিতে বাধা নাই। কয়েক বৎসর আগে একই সপ্তাহের মধ্যে দুইজন মরিয়াছেন কলেরায়, আর এবারের নিদারুণ ম্যালেরিয়ায় আর একজন দেহ রক্ষা করিয়াছেন। তিনটী উজ্জ্বল দীপ একে একে নিবিয়া গেল, গ্রাম হইল আঁধার।

প্রথমে মেলার কথাই ধরা যা'ক। শশী অধিকারীর বড় মেয়ে সরযু যখন বেশ ডাগর হইয়া উঠিল, বিবাহ না দিলে আর নয়,—তখন একদিন শশী স্বপ্ন দেখিলেন, "খাজা

কাঁঠাল গাছের দশ হাত উত্তরে আমি আছি,—পূজা দে।" ঢোল পিটাইয়া—শশী স্বপ্ন বৃত্তান্ত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মজুর লাগাইয়া গৃহ সংলগ্ন চার বিঘার বাগান সাফ করাইলেন। গেরুয়া কাপড় পরিয়া কপালে সিন্দুর টিপ দিয়া শশীর পূজা করিবার কি ঘটা! নির্দ্দিষ্ট জায়গায়—জল দুধ ঢালিয়া বিল্বপত্রে পূজা দিলেই শিব মাথা তুলিবেন। মৃগচর্ম্মের আসনে চোখ বুজিয়া শশী ধ্যান আরম্ভ করিলেন, বাড়ীর মেয়েরা আসিয়া হুলুধ্বনি দিয়া জল ও দুধ ঢালিতে লাগিল। কাঁঠাল গাছের গোড়ায় বসিয়া জয়নাল ঢাকী ঢাক বাজাইতে লাগিল। ঢাক থামিলে—বাজে ঢোল ও কাঁসি। পথের লোক দাঁড়াইয়া ব্যাপার কি ভাল করিয়া শুনিয়া যায়।

পরের দিন ভোরে শোনা গেল স্বপ্ন সফল হইতে চলিয়াছে। যেখানে ঠাকুর উঠিবার কথা সেখানে মাটি ফাটিয়াছে। আশে পাশের গ্রাম হইতে বহু লোক ছুটিয়া আসিল। সেদিনের আদেশ শুধু দুধ দিয়া পূজা করিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে সিধা। মেয়েরা আসিয়া দুধ ঢালিতে লাগিল, কেহ কেহ চাল ডাল তরকারী আনিয়া শশীর আসনের সম্মুখে রাখিল, দুই চারটি পয়সাও পড়িল। লোকের ভিড় বাড়িতে লাগিল। সন্ধ্যার দিকে কীর্তন সুরু হইল। পরদিন দেখা গেল—মাটী ফুঁড়িয়া ঠাকুরের মাথা দেখা দিয়াছে : শিবের লিঙ্গমূর্ত্তি। কথাটা রাষ্ট্র হইতে না হইতে সে কি ভিড়! প্রথমে দুই চার মাইল—তাহার পর আট দশ মাইল—এবং শেষে পনের ষোল মাইল দূর হইতে লোক আসিতে আরম্ভ করিল। ঠাকুরের মাথায় পড়িল দুধ ও বিল্বপত্র—শশীর আসনের সমুখে জড়ো হইল—চাল, ডাল, তরকারী, পয়সা, দুয়ানী, সিকি। মহোৎসব আরম্ভ হইয়া গেল। দূরাগত ভক্তরা ওখানেই প্রসাদ পাইতে লাগিল।

রাত্রে কাহারও থাকিবার হুকুম নাই। শশী তখন ঠাকুরের আদেশ পান। শশী প্রচার করিতে লাগিলেন—ঠাকুর সর্বাঙ্গ প্রকাশ করিলে দুধ ঢালিতে নিষেধ। মেলা বসিয়া গেল। অন্তরঙ্গ ভক্তেরা মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য চাঁদা ও ঠাকুরের প্রণামী ও সেবাইত শশীর দক্ষিণা সংগ্রহে মন দিলেন। প্রতিদিন যাহা সংগ্রহ হইতে লাগিল —তাহার পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। সকলে চলিয়া গেলে রাত্রে শশী গণিয়া দেখিতেন— প্রায় একশো দেড়শো টাকা হইবে। শশী পরম ভক্তিভরে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেন।

চার পাঁচ দিন পর রাত্রিশেষে শশী ঘুমাইলে গ্রামের কয়েকটা চ্যাংড়া ছেলে চুপি চুপি আসিয়া কোদালি দিয়া ঠাকুরের চারিপাশে খুঁড়িয়া ঠাকুর তুলিয়া ফেলিল। আরও দুই এক কোপ কোদালি চালাইলে দেখা গেল কয়েক বস্তা ছোলা, ভিজিয়া

একেবারে কাঁপিয়া উঠিয়াছে। ঠাকুরটীকে বারান্দার এক জলচৌকীতে বসাইয়া তাহারা বাগানের এক পাশে বসিয়া প্রভাতের অপেক্ষা করিতে লাগিল, শশীঠাকুরকে তাহারা দেখিয়া লইবে।

সকালে শশী অধিকারীকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

ঠাকুরের কৃপায় সরযুর অবশ্য সেই বছরই ফাল্গুন মাসে বিবাহ হইয়া গেল।

বারুইপাড়ার দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি—নামটা করিব? পুলিশের ভয় এড়াইয়া অনেক জমিদার তালুকদার কাঁদাইয়া তিনি পরলোক যাত্রা করিয়াছেন, সুতরাং এখন আর তার নাম বলিতে বাধা নাই: নাম ছিল তাঁর মাণিক ঘোষ। মাণিক সত্যই মাণিক, জাল দলিল তৈরী করিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধ হস্ত: বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজ আমলের প্রথম যুগ পর্য্যন্ত যত সাল আছে—তার পুরাণো ষ্ট্যাম্প তার ঘরে ছিল, দুই শত টাকার কম কোন দলিলে তিনি হাত দিতেন না। ডান হাত বাঁ হাত—দুই হাতেই তিনি সমান নকল করিতে পারিতেন —যে কোন রকম লেখা। তাহার মৃত্যুতে কেহ বা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে, কেহ বা চোখের জল ফেলিয়াছে।

আর একটী রত্ন—আমি তার নাম করিতে ভয় করি না। যাহাদের হাঁড়ি ফাটিবার ভয় আছে, তাহারা না হয় এখানে একটু চোখ বুজিবেন। রত্নটীর নাম জগদ্বন্ধু চক্রবর্ত্তী। হাঁড়ি ফাটিবার ভয়ে পুরা নাম আর কেহ লইত না, তাহার কথা বলিতে হইলে সবাই বলিত চক্‌কোত্তি। ইহাকে লইয়াই আমাদের কাহিনী, সুতরাং তার নামের আমাদের বারবার প্রয়োজন হইবে। সকলেই যাহাতে নির্ভয়ে কাহিনীটা পড়িতে পারেন—তাই আমরাও তাহাকে চক্‌কোত্তিই বলিব।

চক্‌কোত্তি অবশ্য বিবাহ করিয়াছিলেন—তবে সেটা নাকি অতি বাল্যকালে তার পিতার ইচ্ছাতেই ঘটিয়াছিল, ইহাতে তাহার কোন হাত ছিল না। সন্তানাদি তাহার হয় নাই। লোকে বলে, তার স্ত্রীকে নাকি রাত্রে রান্নাঘরে শুইতে হইত। এটা কিন্তু লোকের বাড়াবাড়ি,—তার স্ত্রী হয়ত বন্ধ্যাই থাকিবেন।

মাঝে মাঝে চক্‌কোত্তি চাকুরীতে বাহির হইতেন। প্রথম যে বার চক্‌কোত্তি ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, ওগো কা'ল আমি চাকরি করতে বেরুব,—ব্রাহ্মণী ত শুনিয়া অবাক!

তোমার আবার চাকরি হ'ল কোথায়?

কেন,—বাড়ি থেকে বেরুলে আমার চাকরি মারে কে?

কোথায়?

কেন—কুটুম্ব বাড়ি!

ব্রাহ্মণী তবুও বুঝিতে না পারিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

চক্‌কোত্তি স্ত্রীর নির্বুদ্ধিতা দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, বুঝলে না?—এই শোন বুঝিয়ে দিচ্ছি: প্রথমে যাবো ভাগনে বাড়ি, থাকব দিন দশেক,—সেখান থেকে যাবো তোমার বাপের বাড়ি—সেখানে দিন দশেক,—হ'ল কুড়ি, সেখান থেকে ফেলু মামার ওখানে, সেখানেও আট দশ দিন, মেজো পিসীমা গেলে কত খুসি হন, সেখানে কয়েক দিন, তা ছাড়া ঝিনাইদার ও দিকে তিন শিষ্য বাড়ি রয়েছে—সেখানেও তিন দশে তিরিশ দিন,—সর্ব সাকুল্যে ছ'মাসের উপর হ'ল কিনা?

নির্বুদ্ধি ব্রাহ্মণী তবুও কিছু বুঝিতে না পারিয়া হাঁ করিয়া রহিলেন।

হাঁ করে রইলে যে! চাকরি হ'ল না?—বাড়িতে থাকলে খেতাম কত? কুটুম বাড়ি যেমন করে খাওয়ায় তা খেতে অন্ততঃ মাসে দশ টাকা,—কেমন—ঠিক কি না? তবে?—ছমাসের উপর—দশটাকা মাইনের চাকরি হ'ল কি না?

শুনিয়া কপালে হাত দিয়া ব্রাহ্মণী সেই একবার মাত্র বলিয়াছিলেন, ওঃ আমারি পোড়া কপাল,—এই তোমার চাকরি?

পছন্দ হ'ল না? হুঁ,—নইলে আর বলেছে কেন—স্ত্রী-বুদ্ধি——

পরের বাড়ি যাহার খাইতে এত লোভ তাহার বাড়িতে নাকি কেহই কোন দিন একখানা পাতা পাড়িতে পারে নাই।

চক্‌কোত্তির মাছ খাওয়ার গল্পও এখনও দশ বিশ গ্রামের লোকে করিয়া থাকে। একখানা মাছে তাহার তিন দিন চলিত। প্রথম দিন মাছের ঝোলটুকু খাইয়া মাছ তুলিয়া রাখা হইত, পর দিন সেই মাছের সঙ্গে তরকারী দিয়া আবার ঝোল হইত; চক্‌কোত্তি সে দিন খাইতেন ঝোল ও তরকারি;—তাহার পর দিন সেই মাছ কড়া করিয়া ভাজিয়া আবার রান্না হইত, চক্‌কোত্তি তখন মাছ ও ঝোল দুই-ই খাইতেন।

চক্‌কোত্তির আর এক গোপন কারবার ছিল। তাহার ঘরে সরু একটা উকো ছিল। ধান বিক্রী, বা শিষ্য বাড়ীর প্রণামী প্রভৃতির টাকা ঘরে আনিয়া তিনি রাত্রে উহার খাঁজে খাঁজে উকো দিয়া ঘষিতেন। অনেকগুলি টাকা ঘষিতেন। অনেক গুলি টাকা ঘষিলে কিছু রূপা বাহির হইত। ঘষা টাকা বদল দিয়া আবার অন্য টাকা সংগ্রহ করিতেন—আবার তাহা লইয়া ঘষা সুরু করিয়া দিতেন। এমনি করিয়া কয়েক ভরি রূপা সংগ্রহ হইলেই তিনি স্যাকরার দোকানে বিক্রী করিয়া আসিতেন।

ভিখারী বোষ্টম তার বাড়ী কোন দিন এক মুঠা ভিক্ষা পায় নাই। কেহ ভিক্ষা

চাহিতে আসিলেই তিনি কুড়াল আগাইয়া দিয়া কাঠ দেখাইয়া দিতেন : নে চেলা কর,—জোয়ান মর্দ্দ মিনসে, কাজ না করে মাগনা খাবেন !

অতিথি আসিলে তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া ঝাঁটা ধরিতেন : মরবার আর জায়গা পেলে না,—এলে চক্কোত্তির বাড়ী, চক্কোত্তির অমনি গোলা ভরা ধান রয়েছে—না ?

গ্রামের চেংড়া ছেলেরা আবার দুষ্টামি করিয়া অতিথি অভ্যাগতদের এই বাড়ি দেখাইয়া দিত।

একবার অতিথি লইয়া কি কাণ্ডই না ঘটিয়া গেল। লোকে এখনও গল্প করে—

দক্ষিণপাড়ায় মজুমদার বাড়িতে মেয়ের বিয়ে। বৈশাখ মাস। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া আসিল। চক্কোত্তি বারান্দায় বসিয়া আট হাতি ধুতী পরিয়া তাঁতো কাটিতেছিলেন—অর্থাৎ কাঠের তকলি উরুতে ঘুরাইয়া পাটের দড়ি তৈরী করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণী স্নান করিয়া আসিয়া জলভরা কলসী রান্নাঘরের রকে রাখিলেই চক্কোত্তি হাঁকিলেন,—কি গো রাঁধবে না কি ঠিক করলে ?

রাঁধব না ত উপোষ করে থাকব না কি ?

চা'ল কিন্তু এ বেলা দুটি কম করেই নিও, ও বেলা আবার নিমন্ত্রণ আছে কি না,—তোমার ত নিমন্ত্রণ !

একটা ছোট্ট "হুঁ" ছাড়া ব্রাহ্মণী আর কোন উত্তর দিলেন না।

আর ডাল রাঁধবার দরকার নেই,—দুটো বেগুন ভাতে দিলেই হবে—বুঝলে।

ব্রাহ্মণী কোন উত্তর দিলেন না।

কি গো উত্তর দিলে না যে ?

ব্রাহ্মণী কি উত্তর দিতে যাইবেন এমন সময় বাহির হইতে কে বলিয়া উঠিল,—বাড়ী আছেন ?··· কে বাড়ী আছেন ?

কেহই কোন উত্তর দিল না দেখিয়া বলিয়া উঠিল, এই যে !···এটা ব্রাহ্মণ বাড়ি ত ? হাঁ, এই ত মশায়ের গলায় পৈতে দেখছি। বাবা, বাঁচলাম—এত দূর থেকে আসছি—পথের ধারে একটা যদি ব্রাহ্মণ বাড়ী পড়ে !—একেবারে পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশ মশায়,—একেবারে—

চক্কোত্তি তকলি থামাইয়া এতক্ষণ একদৃষ্টে আগন্তুকের মুখের দিকে শুধু চাহিয়া ছিল একবার চোখ পাকাইয়া বলিল,—কি চাই আপনার ?

আমি অতিথ থাকতে চাই। বড্ড বেলা হয়ে গেছে, মশায়,—রোদ্দুর দেখেছেন ? শালার মাটি যেন চন্ চন্ করছে।

কোথায় অতিথ থাকবেন আপনি ?

কেন,—আপনার বাড়িতে !

আমার বাড়ি কোথায় ?

কেন, এ আপনার বাড়ি নয় ?

না।

তবে—আপনি— ?

আমিও এ বাড়ির অতিথ।

ওঃ!

লোকটা এইবার বারান্দায় উঠিয়া বসিল। বসিবার কোন আসন ছিল না, লোকটা মাটিতেই বসিল। ছাতাটা দিয়া পায়ের ধুলা সাধ্যমত ঝাড়িয়া ভালো হইয়া বসিল।

একবার তামাক ইচ্ছা হ'ক।

শুনিয়া চক্‌কোত্তি তাহার দিকে একবার কটমট করিয়া তাকাইলেন। পাশেই হুকা, কলিকা, তামাকের ভাড় ও মালসা ভরা আগুন ছিল, লোকটা তামাক সাজিতে কলিকা হাতে উঠাইতেছিল,—চক্‌কোত্তি তাহার হাত হইতে ছোঁ মারিয়া কলিকা লইয়া নিজেই তামাক সাজিতে আরম্ভ করিল।

তামাক সাজা হইলে চক্‌কোত্তি নিজেই উহা টানিতে লাগিলেন, টানিতে টানিতে যখন আর কিছুই রইল না, তখন মাটিতে নামাইয়া রাখিলেন। লোকটা তাহাই দু'-একবার টানিল, কিছুই পাইল না।

চক্রবর্তী-গৃহিণী কাপড় ছাড়িয়া চা'ল লইয়া রান্নাঘরে যাইতেছিলেন—লোকটা তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, চা'ল দুটো বেশী করেই নেবেন, মা, বড়ই খিদে পেয়েছে, অনেক দূর থেকে এসেছি কি না!

ব্রাহ্মণী যাইবার পথে একটু থামিয়া লোকটার কথাগুলি যেন শুনিলেন।

চক্‌কোত্তি দাঁতে দাঁত ঘষিতে লাগিলেন।

লোকটা চক্‌কোত্তির সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য দুই একটা কথা পাড়িতে লাগিল: আপনি ত বলছেন এ বাড়ির অতিথ,—তা' আপনার বাড়ি কোন গাঁয় ?—এরা কি হ'ন আপনার ?— চক্‌কোত্তি একটি কথারও জবাব দিল না।

দুপুরের সূর্য প্রায় পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। ব্রাহ্মণী একটা ছোট পাথরের বাটিতে খানিকটা তেল আনিয়া বারান্দায় রাখিয়া গেল। চক্‌কোত্তি ছোঁ মারিয়া বাটিটা লইয়া সমস্ত তেলখানি নিজেই মাখিয়া ফেলিল,—তাহার পর গাড়ু হাতে গামছা কাঁধে নদীতে চলিল।

তেলের বাটিতে আঙুল ঘষিয়া যাহা পাইল তাহাই গায়ে মাথায় বুলাইয়া চক্কোত্তির পিছু পিছু লোকটা নদীতে চলিল। নদীতে গিয়াই লোকটার গতি-বিধি যেন অসম্ভব দ্রুত হইয়া উঠিল। চক্কোত্তি গ্যাড়ু মাজিতে বসিলেন, ইহার মাঝেই লোকটা গোটা দুই ডুব দিয়া আঁচলে মাথা মুছিতে মুছিতে চক্কোত্তির বাড়ির দিকে ছুটিল।

ব্যাপার দেখিয়া চক্কোত্তি প্রমাদ গণিলেন। তিনিও তাড়াতাড়ি স্নান করিতে নদীতে নামিলেন।

এদিকে লোকটা আসিয়াই দেখে বারান্দায় বাঁশের আড়াতে একখানা কাপড় ঝুলিতেছে, সে তাড়াতাড়ি সেখানা পরিয়া বলিল,—বড়ই খিদে পেয়েছে, মা শীগ্‌গির দুটী ভাত,—বুড়ো মানুষ খিদে সইতে পারি না।

লোকটা কিছুতেই যাইবেনা দেখিয়া চক্রবর্তী-গৃহিণী রান্নাঘরের বারান্দায় দুখানি পিঁড়ী পাতিয়া দু'গেলাস জল রাখিয়া ঠাঁই করিয়া রাখিয়া ছিলেন : স্বামী ও অতিথি খাইতে বসিবেন। স্বামীর আসিতে দেরী আছে—অতিথি ক্ষুধার্ত ; তাই তিনি এক থালা ভাত একটা আসনের সামনে রাখিলেন।

অতিথি খাইতে বসিয়াই গো-গ্রাসে গিলিতে লাগিল।

চক্কোত্তি আসিয়াই আড়ায় কাপড় না দেখিয়া ক্ষেপিয়া গেল, রান্নাঘরের বারান্দায় তখনও তার নজর পড়ে নাই—

আমার কাপড় কই ? কাপড় নিল কোন শালা ?

হঠাৎ নজর পড়িয়া গেল রান্নাঘরের বারান্দায়,—

তবে, রে শালি !—বলিয়া চক্কোত্তি ভিজা কাপড়েই উন্মত্তের ন্যায় রান্নাঘরে ছুটিল—

কার ভাত দিস তুই লোককে—বড় যে দরদ দেখি—বলি কিসের দরদ এত ——

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া—কটমট শব্দে চক্কোত্তি রান্নাঘরে গিয়া বউয়ের চুল ধরিল : দরদ বের করে দিচ্ছি আমি।

বউ চীৎকার করিয়া উঠিল,—পিঠে মাথায় পড়িল তার কীল ঘুসি চড়—

মুহূর্তে ভাতের থালা ফেলিয়া এঁটো হাতে গিয়া অতিথি চক্কোত্তিকে জাপটাইয়া ধরিল : তবে রে শালা,—পরের বোউকে মারো তুমি—?

চক্কোত্তি বউকে ছাড়িয়া অতিথিকে মারিলেন ঘুষি।

অতিথি এঁটো হাতেই চক্কোত্তিকে লাগাইয়া দিল দুই তিন চড়।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিক্রমে মারামারি সুরু হইয়া গেল। ব্রাহ্মণী, মেরে ফেল্‌লে রে

মেরে ফেল্‌লে,—বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুই মল্লের ভীম আস্ফালন। প্রতিবেশীরা ছুটিয়া আসিল—যে বাড়ী বিবাহ হইতেছে সেখান হইতে অনেক বরযাত্রী ছুটিয়া আসিল।

দুই বীরকে মল্লযুদ্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সবাই বলে, ব্যাপার কি? অতিথি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলে,—শালা পরের বোউকে মারে চক্কোত্তি দাঁত মুখ খিচাইয়া বলেন,—অ্যাঁ, আমার বউ—না - ওর বউ,—উড়ে এলেন শ্যাখ—তার ধঁচমঁচানি ছাখ।

অতিথি সবার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলে,—মশায়—দেখুন,—উনিও অতিথি আমিও অতিথি,—অতিথি হয়ে উনি পরের বউ মারবেন--আর তাই আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব?

পাশের এক প্রতিবেশী বলিয়া উঠিল,—উনিও অতিথি কে বল্‌লে?

উনি নিজেই বলেছেন,—একবার জিজ্ঞাসা করে দেখুন না!

সবাই হাসিতে লাগিল: উনি অতিথি ন'ন, মশায়,—উনিই বাড়ীওয়ালা।

অনুতপ্তের ভঙ্গীতে অতিথি বলিল, তা আমি কি করে জানবো মশায়.--আমরা বিদেশী লোক।

বরযাত্রীরা হাসি চাপিতে পারিতেছে না।

অতিথি তাহাদের কাছে আগাইয়া গিয়া বলিল,—কই আমার সন্দেশ?

রসো,—আনতে গেছে।

প্রতিবেশীরা আশ্চর্য হইয়া এ ওর মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

গ্রামেরই দুইটী ছেলে বিবাহ বাড়ি হইতে দুই হাঁড়ি সন্দেশ মাথায় করিয়া ছুটিয়া আসিল।

চক্কোত্তির চির-শত্রু আশু অধিকারী আসিয়া হাসিয়া দাঁড়াইলেন, অতিথির দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, আপনি যে এবাড়ি খেয়েছেন তার প্রমাণ কি?

প্রমাণ?—প্রমাণ ঐ দেখুন বারান্দায় এঁটো থালা,—আর আমার হাত।

চারিদিক হইতে ছেলের দল হাসিয়া উঠিল: হেরে গেলেন আপনি, আশুদা, বাজি হারলেন আপনি!

অতিথি জয়রাম হাত বাড়াইয়া বলিল, দিন আমার সন্দেশ, দিন—।

হাতটা ধুয়ে আসুন, মশায়, এঁটো হাত—

হাঁ, হাঁ,—ভুলেই গেছলুম.—তা, আতুরে নিয়ম নাস্তি।

হাত ধুইয়া জয়রাম প্রথমে ছেলেদের হাতে সন্দেশ বাঁটিয়া দিল, ছেলেরা আনন্দে

কলরব করিতে লাগিল। তাহার পর দেওয়া হইল বরযাত্রিদের, তাহারা এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল, জয় জয়রাম-দার জয়।

জয়রাম অবশেষে চক্কোত্তির হাত ধরিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, আসুন মশায়, এইবার আমরা,—পরস্পরের হাতের মার খেয়েছি এইবার সন্দেশ চেখে দেখা যা'ক—

—বলিয়া চক্কোত্তির মুখে একটী সন্দেশ তুলিয়া দিল:

নিন,—আপনি একটা আমার মুখে তুলে দিন,—দিন—দেরী করবেন না—

বলিয়া আর একটা সন্দেশ তাহার হাতে তুলিয়া দিল।

ইজিচেয়ার

সুশীল রায়

আমার ইজিচেয়ারের কাপড়টা চকোলেট রঙের। আগে ছিলো নীল কাপড়ের ওপর লাল দাগ টানা। সম্প্রতি কাপড় বদ্‌লেছি।

হাতে যখন কোনো কাজ থাকে না, মাথায় যখন কোনো মতলব থাকে না, আমি তখন ইজিচেয়ারে ব'সে ঝিমাই। সমস্ত শরীর দিয়ে আমি-যেন চকোলেটের স্বাদ নিই। কি-রকম একটা নিস্তেজ আরামে মিষ্টি ও মোলায়েম অবকাশটি আমি কায়ঃ-মনে উপভোগ করার চেষ্টা করি। এই ভাবে বসে থাকলে মনে হয়, আমি যেন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মোহে পড়ে আমূল বদলে গেছি: আমি-যেন আর সচল জীব নই। যেটুকু আমার প্রাণশক্তি আছে, সব যেন রূপান্তরিত হ'য়েছে একটি নির্জীব বিন্দুতে। সেই পরিষ্কার জ্যামিতিক বিন্দুর ভেতর দিয়ে আমার শরীরের শক্তি পৃথিবীর কেন্দ্রের সঙ্গে যেন টাগ-অব-ওয়ার খেলছে। আর মাঝপথে ইজিচেয়ারটি নির্বিকার আয়াসে আমাকে বলিষ্ঠ হাতে ধ'রে ব'সে আছে। এই সময় ইজিচেয়ারের মধ্যস্থতা না থাকলে আমি-যেন নির্বিবাদে তলিয়ে যেতাম।

যখন কোনো কাজ থাকে না, ইজিচেয়ারের দাম তখন অনেক। আমি হাত-পা ছড়িয়ে গা ছেড়ে দিয়ে বেআড়া ভঙ্গীতে আরাম উপভোগ করি। ইজিচেয়ার অভ্যর্থনার ভঙ্গীতে হাত পা ছড়িয়ে সর্বদাই ব'সে থাকে, অবশ্য তার কখনই কোন কাজ নেই ব'লে। সেই জন্যেই যাদের কোনো কাজ নেই, তাদের সঙ্গে তার এত আত্মীয়তা। অবসর ও আলস্যের একমাত্র বাহন ইজিচেয়ার। এমন কোনো দ্বিতীয় আসন আজো দেখি নি, যে-আসন থেকে এমন নির্দোষ আরাম সঞ্চয় করা যেতে পারে। অতএব ইজিচেয়ারই আসন-রাজ্যের একমাত্র সক্ষম সম্রাট। এই সাম্রাজ্যের ছোটোখাটো, খ্যাত অখ্যাত যে সব জাগীরদার বা তালুকদারদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে, তাদের সকলেই প্রায় কাঠখোট্টা তাদের সঙ্গে ব্যবহারে এমন আরাম পাওয়া যায় না। এদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের এই অনাভিজাত্যের কথা জানে, এবং জানে ব'লেই ত্রুটি ঢাকবার চেষ্টা করে বিভিন্ন সৌখীন পোষাক প'রে। অমায়িক চেহারা নিয়ে ভদ্র ব্যবহার করার জন্যে উৎসুক হ'লেও সহজেই আমরা বুঝতে পারি, এটা এর বাইরের বিনীত মুখস মাত্র, এর ঔদ্ধত্য আধ ইঞ্চি নিচেই ঢাকা আছে। আমরা তাই বেশীক্ষণ এদের ব্যবহার পেতে চাইনে। অবশ্য আমি

তো চাইনে। আমার মন তখন সহজ শিষ্টাচারী ইজিচেয়ারের জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। মন-ভুলানো পোষাক দিয়ে চেহারায় শালীনতা হয়ত অনেক কষ্ট করে আনা যায়, কিন্তু গায়ে গা লাগিয়ে একটু ঘনিষ্ঠ হ'লেই আমরা আসল রূপের সাক্ষাত বিনা পরিশ্রমেই পেয়ে যাই। ভেতরটাই যার শালীনতায় ঠাস-বুনন, তার আর পোষাকের দরকার করে না। আমার ইজিচেয়ারটি পোষাক সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন, শুধুমাত্র চকোলেট-রঙের চাদরটিই তার অঙ্গবাস : অথচ কী নম্র কী বিনীত এর ব্যবহার! আমার ইচ্ছে করে, আমি আমার জীবনটি একটা অখণ্ড অবসরে যদি ভরাট করে তুলতে পারি, তাহ'লে আমার ইজিচেয়ারের সঙ্গে সখ্য যেন আরো দৃঢ় হয়। প্রত্যহের এমন ভাঙা-ভাঙা রসালাপে ও ছেড়া-ছেঁড়া অবসরে আমাদের দু'জনের মধ্যের বন্ধুত্ব যেন জমাটরূপ নিতে পারছে না। আমাদের মিত্রতা গলিত লোহার মতো ভারিক্কে তারল্যে যেন কেমন টলটল করছে। মাথার বুদ্ধি নানাবিধ কর্তব্য কাজে নিঃশেষে ফুরিয়ে একেবারে যখন ফতুর হয়ে যাই, তখন আসি ইজিচেয়ারের কাছে। কিন্তু কী উদার কী অমায়িক এর ব্যবহার। এতটা অবহেলাতেও তার এতটুকু অভিমান নেই। সব সময়ই আমাকে একইভাবে দন্তহীন হাসিমুখে নীরব অভ্যর্থনা জানায়। আমার চিন্তাহীন মস্তিষ্কে ধীরে ধীরে এনে দেয় চিন্তার শব্দহীন ও মন্থর স্রোত। আমি ব'সে ব'সে ভাবি। এতটুকু রোমাঞ্চ নেই, বিন্দুমাত্র উত্তেজনা নেই, তখনকার চিন্তায় কী চমৎকার আনন্দ কী মোলায়েম অভিজ্ঞতা! সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর এ-আরামের তুলনা পাইনে। চোখ পুরো বা আদ্দেক বন্ধ ক'রে এইভাবে মুখরোচক চকোলেট চুষতে অনেক শিশুকেও আমি দেখেছি। জিভের জল দিয়ে জারিয়ে জারিয়ে আমিও ইজিচেয়ারের রস তেমনি উপভোগ করি। কখনো পা দু'টো টেনে নিই কোলের মধ্যে, কখনো পা ছড়িয়ে দিই মোড়ার ওপর। কিন্তু এত নড়াচড়া সত্ত্বেও আমার শরীরের সেণ্টার-অব্-গ্র্যাভিটি বৈজ্ঞানিক বিন্দুটি থেকে নিশ্চয়ই স্থানচ্যুত হয় না। কেন না, শরীরের ব্যালান্স কোনোদিনই হারিয়ে ফেলিনি। জ্যামিতিক বিন্দুর যেমন আয়তন নেই অথচ অবস্থান আছে, আমার শরীরের আয়তনও তখন যেন থাকে না—কিন্তু আমি অবশ্যই থাকি। তার সঙ্গে থাকে আমার সংজ্ঞাহীন চেতনা। নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন না থাকলেও আমি বুঝতে পারি, আমি আমার অস্তিত্বের সগৌরব ঘোষণা নিয়েই ব্যস্ত আছি। মাথায় ধীরে ধীরে মতলব আসতে আরম্ভ করে, আমি ভাবি : একটা কবিতা লিখলে মন্দ হ'তো না। সেই জলঙ্গী-স্টিমার স্টেশনের বীভৎস কলিশন নিয়ে অথবা চারঘাটের গরুর গাড়ীর চাকার মৃদু মচমচ শব্দ নিয়ে। মাথার মতলব ধীরে ধীরে ফেঁপে ওঠে। বেলুনে কে যেন সজোরে ফুঁ দিয়ে হাওয়া পুরতে আরম্ভ ক'রে দেয়। চোখের সামনে নেমে আসে দারুণ গ্রীষ্মের দুপুরে পদ্মার কিনারে

ইঙ্কির ঘাটে স্কুল-পালানো বাল্যস্মৃতি। চিন্তাগুলো প্রথমে আসে মন্থর স্রোত নিয়ে, হঠাৎ স্রোত প্রচণ্ড বেগে ছুটতে আরম্ভ করেই আবার কখন থেমে যায়, টের পাইনে। যখন হুঁস হয়, তখন আমি হয়ত ভাবছি বর্তমান জীবনের অতি সাধারণ পদস্খলনের কথা। অনেকগুলো চিন্তা একসঙ্গে এমন বেকায়দায় জড়িয়ে যায় যে, চকোলেট রঙের কাপড়ের ওপর ব'সে এই গিট খুলতে গিয়ে আমি ভায়োলেট ফুলের কথা ভাবতে বসি: কোন্ এক সুদূর যুদ্ধক্ষেত্রে ট্রেঞ্চের পাঁকে ফোটা নীল-রঙের ভায়োলেট ফুল। সেখানে কড়া বারুদের গন্ধের মধ্যে কোনো অখ্যাত কবি-সৈনিক হয়ত দুলাইন কবিতা লিখে সেটা বিদেশী ফুলের পাপড়ির সঙ্গে স্বদেশের কারো উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেবার মতলব করছে, এমন সময় আকাশ থেকে প্রকাণ্ড একটি বারুদের ডেলা মাটিতে প'ড়ে এমন প্রচণ্ড শব্দের সৃষ্টি করলো-যে তার কবিত্ব গেলো উবে, মতলব গেলো ভেঙে। এদিকে আমিও হয়ত আচমকা দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে ইজিচেয়ারের ওপর চমকে উঠলাম। দরজা খুলে দেখলাম, সশরীরে সম্মুখে হয়ত কেউ দাঁড়িয়ে। এতে আমার বড় বিরক্ত লাগে। আগন্তুক ব্যক্তি যেই হোক্-না কেন, আমার ইচ্ছে করে বারুদের কড়া গন্ধের মতো ঝাঁঝালো ভাষায় আমি তাঁকে দু'কথা শুনিয়ে দিই। আমি যখন ইজিচেয়ারে ব'সে থাকি, তখন জেনে রাখা দরকার-যে তখন আমার কোনোই কাজ নেই, আমি তখন কারো অধীন নেই, তখনকার সময় সম্পূর্ণ আমার একার, সে-সময়ের ভাগ আমি একবিন্দুও কাউকে দিতে নারাজ। আমার মহার্ঘ মুহূর্তগুলি এভাবে বাজে ব্যয় হ'লে আমার জীবনের কি-পরিমাণ লোকসান, তা সকলের জানা দরকার। আমি-যে দিনের পরিশ্রম দিয়ে দিনান্তের অবসর রোজগার করি, তা নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার জন্যে নয়। একহাতে সময়ের সম্মুখের ঝুঁটি ধ'রে অন্য হাতে সময়ের পিঠে চাবুক মেরে আমি সময় নিয়ে দিগ্বিজয় করতে চাই। কিন্তু এই দিগ্বিজয়ের প্রেরণার মধ্যে এতটুকু বেগ থাকবে না, স্বচ্ছ নিটোল চৌবাচ্চার জলের মতো তা হবে নির্বেগ, নিরুদ্বেগ। বিড়ালের মতো হাল্কা থাবায় ভর করে সময় নিঃশব্দে আমাকে কেন্দ্র করে সুধু পাক খাবে। এটা হয়ত অদ্ভুত রকমের অভিযান, আমি ইজিচেয়ারে ব'সে এই ধরণের অভিযানই পছন্দ করি।

মাঝে মাঝে আমি ইজিচেয়ারে ব'সে দোল খাই: মনে হয়, এবার বুঝি সত্যিই দিগ্বিজয়ে রওনা হ'য়েছি। আমার বাহন যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে সম্মুখ দিকে, কিন্তু বুঝতে পারি, তার পায়ের খুরে পাখোয়াজ বাজানো তার পেশা নয়। কেননা, সে চতুষ্পদ হ'লেও চতুষ্পদ জন্তু নয়,—সে শিষ্টাচার, সে ইজিচেয়ার।

শিষ্টাচার সে অবশ্যই: তার প্রধান শত্রুও একথা অস্বীকার করবেনা। কিন্তু এত গুণে গুণবান্ ব'লেই যে তার চরিত্রে দোষ নেই, এমন কথা বলার সাহস পাইনে। আমি জানি,

তার মতো অলস নিরুৎসাহ ও অকর্মণ্য বস্তু আর নেই। তার স্বভাবে যেটুকু গ'ত আছে, অন্যের মধ্যে তা চালান ক'রে দিতে সে ভারী ওস্তাদ। চুপচাপ ব'সে প্ল্যান করতে, কিছু না বুঝে সমঝদারের ভঙ্গীতে নীরব থাকতে, অন্যের কাজ পণ্ড করতে সে অদ্বিতীয়। আমাদের এই আসন রাজ্যের সক্ষম সম্রাট রাজ্য-শাসনে একেবারেই অপটু। নীরবে ঘরের কোণে ব'সে জল্পনা-কল্পনা ক'রে একটি অতিরিক্ত-আশার রংমশাল দিয়ে চারদিক জমজমাট ক'রে দিতে এর পটুত্ব অপূর্ব। অর্থাৎ ইজিচেয়ার অতিরিক্ত আশা-বাদী, অদৃষ্ট-বিশ্বাসী ও স্বপ্ন-বিলাসী। এক কথায়, কাজে কর্মে বা চরিত্রে ইজিচেয়ার পুরোপুরি অখণ্ড বাঙালী।

আমি তাই ইজিচেয়ারকে এত ভালবাসি। আমার শরীরের, আমার মনের যতগুলো ভগ্নাংশ হওয়া সম্ভব, সব কটি ইজিচেয়ারের ইঙ্গিতে চলাফেরা করতে রাজি। কিন্তু সে সময় কই? এখানে এই ভাবে ব'সে চুপচাপ বাইরে তাকিয়ে থাকা, বাতাসের সঙ্গে শুরু পাতার মারামারি দেখে হাই তোলা, মাঝে মাঝে ইজিচেয়ার থেকে উঠে একটু পায়চারী ক'রে নেওয়া,—এতে দৈনিক অন্ততঃ পক্ষে ছত্রিশটি ঘণ্টার দরকার। কিন্তু কোন্ অ-পরিণামদর্শী বৈজ্ঞানিক কবে-যে এই মারাত্মক ভুল ক'রে গেছেন, তা আমরা জানিনে। কিন্তু তার ফল ভোগ করতে হ'চ্ছে আমাদের, বিশেষতঃ আমাকে। দিনকে নতুন করে আবার ভাগ করার দায়িত্ব আজ যদি আমাকে দেয়, আমি এক ইজিচেয়ারের জন্যে ছত্রিশের মধ্যে অন্ততঃ বারোঘণ্টা বরাদ্দ করবো। দিনের অন্ততঃ তিন ভাগের একভাগ ইজিচেয়ারের জন্যে ধ'রে না রাখলে তা'কে রীতিমতো উপেক্ষা করা হয়। আমরা কিন্তু বরাবর তা'কে উপেক্ষা ক'রেই আস্‌ছি: উপেক্ষাটা হয়ত তার গা-সওয়া হ'য়ে গেছে, হয়ত বাঙালী-চরিত্র হ'য়েও এ-বিষয়ে তার ভাবপ্রবণতা দেখা যায় না।

ইজিচেয়ারের ওপর এতটা টান থাকার দরুণই বুঝি আমার চরিত্র অনেকটা ইজিচেয়ারের মতো। হাত-পা ছড়িয়ে রাত দিন আমার ব'সে থাকতে ইচ্ছে করে, আর ভাবতে ইচ্ছে করে। একভাবে একদৃষ্টে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে নিশ্চল ব'সে থাকা—আর ভাবা, যে ভাবনার শেষ নেই, সীমা নেই। কবে হয়ত কোন এক সৌখীন ব্যক্তি আমারই মতো অনেক গুলি চিন্তা নিয়ে বিব্রত হ'য়ে প'ড়েছিলেন। একটা জায়গা তিনি চেয়েছিলেন, যেখানে ব'সে তিনি ভাববেন—সুধুই ভাববেন। চিন্তা করবেন, এই চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তা ছিলোনা অথচ তাঁর হাতে সময় ছিল অপর্য্যাপ্ত - সময় কাটাবার আর কোন পথ জানা ছিলোনা তাঁর, তিনি মাঠে মাঠে বনে বনে ঘুরে নিরিবিলি ব'সে ভাববার উপযুক্ত জায়গা খুঁজে বেড়ালেন - কোথাও পেলেন না। অবশেষে একদিন প্রকাণ্ড একটি বটগাছের নীচে এসে উপস্থিত হ'লেন: ঘুরে ঘুরে তিনি পরিশ্রান্ত ছিলেন বটগাছের শেকড়ের উপর ব'সে তিনি পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে

শুয়ে পড়লেন। ধীরে ধীরে তাঁর মাথায় এলো মতলব: তিনি ফিরে গেলেন, এবং তাঁর হাত দিয়েই হয়ত সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হ'লো ইজিচেয়ার। তা যদি হয়, তা'হলে সেই ব্যক্তির নাম ঠিকানা আমাকে কেউ সংগ্রহ ক'রে দেবেন। তাঁর কীর্তি নেহাৎ কম নয়। তিনি যে-জিনিষ আবিষ্কার ক'রে গেছেন, তার মূল্য আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি; অথচ চিরকাল তিনি অজ্ঞাত থেকে যাবেন, এটা কাজের কথা নয়: তাঁর একটা জীবনী লিখে ফেলা দরকার।

গল্প

কমলাক্ষ দাশগুপ্ত

তর্ক উঠলো সৌমেনকে নিয়ে।

সাধাসিধে মানুষটি, দোষের মধ্যে আজকালকার দিনে তার সারল্য একটু বেশী। আর সব দিকে সে একরকম ভালই। জগতে তার মনের মিল একজনের সাথে, সে প্রবীর। প্রবীর একটি পরিপূর্ণ যুবক; তার কথায়-বার্ত্তায়, ভাবে-ভঙ্গীতে, চলনে-বলনে উদ্ধত যৌবন আত্মপ্রকাশ করে। তার যৌবনের মধ্যে সংশয় বা সঙ্কোচের অবসর নেই। সে যেন কোথা থেকে ছিটকে আসা এক টুকরো ব্রাউনিঙ, চণ্ডিদাসের পদাবলীর যতিহীন একটি পদাংশ।

কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ সৌমেন ট্রামে প্রবীরকে দেখে নির্লজ্জের মতো বলেছিল, আপনাকে আমার ভারি ভাল লাগে। প্রবীর উচ্ছ্বসিত হয়ে উত্তর দিয়েছিল, বাঃ রে, ভারি পোয়েটিক তো আপনি। হঠাৎ আমায় ভাল লেগে গেল! তা যাক, কিন্তু আমি যে এখুনি নামবো; আপনি একটু দেরীতে কথাটা প্রকাশ করলেন। তা দেখা করুন না আমার সাথে। কবে? আজই বিকালে আসুন। আমার নাম প্রবীর রায়। প্রবীর ঠিকানা দিয়ে চলন্ত ট্রাম থেকে নেমে পড়েছিল, সৌমেন লজ্জা আর আনন্দ ঢাকবার জন্য একটা সিগারেট ধরিয়েছিল সেদিন।

এই সৌমেনকে নিয়ে আজের তর্ক। প্রশ্ন উঠেছে বট্যানিক্যাল গার্ডন্ যাওয়া নিয়ে। সমীর বলে, চল যাই মোটার হাঁকিয়ে, গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক দিয়ে আশি মাইল স্পীডে গাড়ি ছুটাবো। অনিল বলে, ষ্টিমারে চল, তিন মিনিটে গানের আসর জাকিয়ে তুলবো নির্ঘাৎ। সুনীতি হেসে বলে, চল, খানিক ট্রামে গিয়ে, তারপর পায়ে হেঁটে জোড় অ্যাড্‌ভেঞ্চার করা যাবে, মার্চ্চিং-সং ধরবো, 'চল, চল, চল।' দ্যুৎ, প্রবীর বললো, ডিঙ্গি নৌকো ধরণের ছোট নৌকায়। ষ্টিমারের কাছে গিয়ে ঢেউয়ের মাথায় চড়বো, খাদে নামতে বাতাসে দুলবো। খুসী হলে বট্যানিক্যালকে পেড়িয়ে যাবো, খুসী হলে ডাঙ্গায় উঠবো, খুসী হলে জলে ভাসবো। এমনি সব অভিমতের মধ্যে সৌমেন যখন কিছুতেই নিজের মত প্রকাশ করল না, তখন স্থির হলো, সৌমেন নিজস্ব কোন নতুন মত দেবে না; সে যার মত সমর্থন করবে সেইটেই মেনে নেওয়া হবে। সুতরাং সৌমেন পড়লো বিপদে আর তার বন্ধুরা পড়লো বিতর্কে।

সুনীতি বলে, প্রবীরের দলে ও, সুতরাং আমরা নো হোয়্যার। সমীর বললো, হোক প্রবীরের ইন্টিমেট, কিন্তু যখন ওকে এই সেক্রেড্ টাস্ক দেওয়া হয়েছে, ওর উচিত ইম্পার্শিয়্যাল হওয়া, যেটা প্র্যাক্‌টীকেল্ অথচ রিস্‌কি নয়, সেইটেই বলা উচিত।

অনিল ওদিক থেকে বললো, ক্যান্‌ভাসিং চলবে না, এটা তোমার ইন্‌ডাইরেক্ট্ ক্যান্‌ভাসিং হচ্ছে কিন্তু।

ওদের বাদানুবাদকে থামিয়ে প্রবীর বললো, বলনা রে, কি তোর মত। আচ্ছা ছেলে তো তুই, একটা সামান্য মত দিতে এত দেরী। ফস্ করে বলে ফেল দেখি কি তোর মত।

কি আবার মত? সৌমেন গম্ভীর হলো, নৌকোয় যাবো আমরা। অমনি চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল, পারশিয়্যাল্‌টি নিতান্ত পারশিয়্যাল্‌টি। চড়েছিস কোন দিন আশি মাইল স্পীডের গাড়ি?

নিতান্ত বেরসিক, অনিল পাশ থেকে বলে উঠলো, নিতান্তই বেরসিক তুই। গান শুনতে হলে প্রাণে সুর থাকা দরকার, তার মাথামুণ্ড কিছু আছে নাকি তোর?

সৌমেন এসব কথার কোন প্রতিবাদ না করে নিতান্ত নিস্পৃহভাবে সিগারেট টানতে লাগলো।

অবশেষে তারা ক'জনে মিলে অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর ভাড়া করলে একখানা নৌকো। নৌকো ছাড়তেই অনিল বেপরোয়া হয়ে গান ধরলো, 'ওরে মাঝি তরী হেথায় বাঁধবো না……' ও কিরে, প্রবীর ফস্ করে বলে উঠলো, নৌকো ছাড়তে না ছাড়তেই বাঁধবার উদ্যোগ কেন?

অনিল সে কথায় কান দিলো না মোটেও তার গান সমানে সে গেয়ে চললো।

সৌমেন গিয়ে বসেছে, হাল ধরে যে বুড়ো মাঝি তার কাছে গিয়ে।

কর্ত্তার দেশ কোথায়? সৌমেন তার সাথে রীতিমত গল্প জুড়ে দিলো।

প্রবীর অনেক করে ছোকরা মাঝিটিকে হাত করেছে, সুমুখে যে প্লায়ারটা আসছে তারই দিকে সে নৌকো এগিয়ে নিয়ে চলেছে প্রবীরের কথায়।

মাঝগঙ্গায় বিপদ বাধাস্ নে প্রবীর! সুনীতি খুব গম্ভীরভাবে বললো।

এতই যদি বিপদের ভয়, তবে না এলেই পারতিস, ওদিক থেকে সৌমেন বললো।

তুই থাম, সুনীতি, সমীর, অনিল একসাথে বলে উঠলো, তোরই জন্য তো আসতে হলো।

সহসা একটা ঢেউয়ের উপর উঠে নৌকো টলমল করে উঠলো, প্রবীর হেঁকে বললো ঘাবড়াচ্ছিস কেন রে, 'ডুবি যদি তো ডুবি না কেন, ডুবুক সবি ডুবুক তরী, পড়িস নি?

তোর কবিতা রাখ, অনিল বললো, নৌকো যদি এখন ডোবে, এই ঢেউ ঠেলে সাঁতরে পাড়ে উঠতে পারবি ভেবেছিস?

পাড়ে উঠতেই যে হবে তার কি মানে আছে বল, খানিক মজা করে সাঁতরে নেবো তো ঢেউয়ের মাথায় চড়ে! প্রবীর বললো একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে।

ক্রমশঃ ষ্টিমার দূরে চলে গেল. ওরাও যথাসময় বট্যানিক্যাল্ গার্ডন্এ পৌঁছলো।

ডাঙ্গায় পা দিয়ে সমীর বললো, এখন মনেহ চ্ছে. নৌকো জার্ণিটা নিতান্ত মন্দ নয়।

অনিল বললো, ছৈ-এর ভিতর বসে সিগারেট ফুঁকতে বেশ লাগে কিন্তু। যাঃ, সৌমেন বললো, নৌকায় মানুষে চড়ে, যদি হঠাৎ নৌকো ডুবে যায় মাঝগঙ্গায়, অনিলের গান শেষ হবে কি করে?

তুই থাম, রসিকতা করতে হবে না।—অনিল বললো।

নিশ্চয় থামবো—! সৌমেন সত্যি সত্যি চুপ করলো।

বট্যানিক্যাল্ গার্ডেনএ ঢুকে প্রবীর বললো, আয়, মনে মনে লিষ্ট করে ফেলি কি কি দেখবো আমরা। প্রথমত দেখবো জটাধারী বুড়ো বট, তারপর বহুমুণ্ড খর্জ্জুর বৃক্ষ, তারপর ছায়া-শীতল কুঞ্জশ্রেণী, তারপর সন্ধান করবো এখানে যতো অর্কিড আছে তাদের। এরপর আমাদের চা-পর্ব্ব সমাধান করতে হবে, তারপর অন্যান্য দ্রষ্টব্যগুলি একে একে দেখে নেওয়া যাবে।

এতে কেউ কোন প্রতিবাদ করলো না, এবং তারাও ক্রমশ সব দ্রষ্টব্যগুলোই দেখে নিলো। সব চাইতে ভাল লাগলো উঁচু ঢিবির ওপরের ছায়াঘেরা কুঞ্জগুলো।

সৌমেন, সৌমেন! প্রবীর চেঁচিয়ে ডাকলো। সৌমেন একটু দূরে ছিল, সে উত্তরে বললো, অতো চেঁচাচ্ছিস কেন?

এদিকে আয়, কাব্য করবার জন্য এর চাইতে সুন্দর জায়গা আর পাবিনে। যতো কাব্য তোর ষ্টকে আছে, এখানে বসে আউড়ে যা। দেখেছিস, অনেকটা কলাগাছের মতো গাছগুলো, বোস এই বেঞ্চে। সিগারেট দে একটা। ওরা সব গেল কোথায়? আয় নারে সব এখানে। এই অনিল, বিস্কুটের টিনটা দে তো, খান কতক চিবোই বসে বসে।

কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে শীর্ণ জল স্রোতটির ধারে বসে ওরা চা-পানের উদ্যোগ করলো। প্রবীর ততক্ষণে চিৎপাৎ হয়ে শুয়ে পড়েছে. লাভ্‌লি লাভ্‌লি এসব জায়গা। কেমন চমৎকার ঘাস দেখেছিস—যেন কুশনের উপর শুয়ে আছি। এই অনিল, একটা কাপ দে না এদিকে এগিয়ে।

শুয়ে শুয়ে অতো হুকুম করেনা, খেতে হয়তো উঠে আয় এদিকে। চট্‌ছিস কেন,

তুইও শুয়ে পড়না, তবেই আমার কাছে পৌঁছতে পারবি—কাপটা নিয়ে শুয়ে পড় চট্ করে। থ্যাঙ্কস্।

অনিল চায়ের কাপটা আর কতকগুলো বিস্কুট রেখে গেল, আচ্ছা আলসে তো তুই।

আলসে! আয় দৌড়ো আমার সাথে, দেখি কে আলসে। এই সৌমেন স্টার্ট দে তো।

যা, যা, কে এখন তোর সাথে দৌড়বে, অনিল ধীরে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললো।

দেখলি তো? প্রবীর বললো, এটা আমার মোটেই আলসেমি নয়, ভারি চমৎকার লাগছে এই ঘাসের উপর শুয়ে।

ওদিকে সমীর আর সুনীতি গোটা কয়েক ডাব নিয়ে উপস্থিত হলো।

পাঁচটা দুআনায় পেলাম, তাই। সুনীতি বললো।

বেশ করেছিস, প্রবীর বললো, দে এদিকে একটা।

চা-ডাব একসাথে খাবি? অনিল শুধোলো।

তোর তাতে কি, একশ' বার খাব। এই সুনীতি, দেনা, এদিকে একটা।

এমনি করে ওদের চা-পান আদি শেষ হলো।

ওরা আবার এসে নৌকায় উঠলো।

এবারে অনিল প্রমুখ নৌকো-বিরোধীদল মহা উৎসাহের সাথে নৌকোয় এসে বসলো। আসবার সময়ের অভিজ্ঞতায় তাদের সাহস অনেক বেড়ে গেছে।

ওরা হৈ হৈ করতে করতে যখন চাঁদপাল ঘাটে এসে পৌঁছালো বেলা তখন পাঁচটা।

এরপর কি করা যায়, এই হলো ওদের এখনকার প্রধান সমস্যা।

চাঁদপালঘাট থেকে অনিলদের বাড়ি সব চাইতে কাছে। ওদের সঙ্গে ফ্লাস্ক প্রভৃতি যে জিনিসপত্র ছিল সেগুলো অনিলের বাড়িতে রেখে ওরা বেরিয়ে পড়লো।

বেরিয়ে তো পড়লো, কিন্তু ওরা এখন যাবে কোথায়! আজের দিনে সিনেমায় যাওয়াই ওদের সম্মিলিত অভিমত। এখন প্রশ্ন, কোন্ সিনেমায় আজ ওরা যাবে।

প্রবীর বললো, চল, ইংরেজী কোন অ্যাড্ভেঞ্চারের বই দেখে আসি। অনিল বলে, ইংরেজী ছবিই যদি দেখতে হয়তো মেট্রোয় চল, মেট্রো গোল্ডউইনের গ্র্যাণ্ড মিউজিক্যাল হিট্ আছে, দেখে আসি। সুনীতি বলে, যদি দেখতেই হয়, চলু কোন বাঙ্গলা গানের বই দেখে আসি।

তার চাইতে চল 'দেবদাস' দেখে আসি—সমীর বললো, হাজার হোক ট্র্যাজেডির কদর আলাদা।

এমনি করে প্রশ্নটি ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠলো ; কিছুতেই ঠিক হয় না, কোন্ সিনেমায় যাওয়া যায়।

এবারেও সৌমেন কোন কথা বললো না, অথচ ওর কথামত নৌকো যাত্রায় আজ ওরা সবাই-ই রীতিমত আনন্দ পেয়েছে। সুতরাং তর্ক উঠলো সৌমেনকে নিয়ে, ও যা বলবে, ওরা সবাই সেকথা মেনে নিতে রাজি। সুতরাং সৌমেন পড়লো বিপদে আর বন্ধুরা পড়লো বিতর্কে।

কবিতা

উপসম্পদা

রবীন্দ্র মজুমদার

সঙ্ঘের শরণে যত স্খলধ্বজ স্থবির সন্তান
অভিভূত উপস্বপ্নে ; হায় তথাগত !
(দিগন্তে কি লেগেছে আগুন ?)
স্থবির সম্পদ তব জনারণ্যে কোথা তার স্থান !
বৃথা অন্বেষণে তাই হয়েছি বিরত—
জয়ী আজ মার-মোহতূণ।
প্রজ্ঞার মশাল সে ত' নিভে গেছে, জ্ঞানাগ্নি নির্ব্বাণ।
অগত্যা নিলাম তাই রভসের ব্রত
(এল আজ সোনালী ফাল্গুন)
পুষ্পাগম ঋতুপত্রে রূপালী জ্যোৎস্না-স্নাত গান
(ক্ষমা কোরো, হে অর্হৎ !) রতি-উপগত-
ভ্রমর গুঞ্জন গুণ গুণ ;
বহু অবদমনের শেষে আজ মুক্ত ব্যাজরতি
রসাবেশে লুব্ধ তাই বিযোনিজ অনুষঙ্গ-গতি॥

ঝড়ের পরে

পরেশনাথ সান্যাল

পুতুলের মুখ রক্তিমতর
কিন্তু তারা তো মানুষ নয়,
এরা যে মানুষ— মানুষের শিশু
মৃত্যুতে এরা মলিন হয়।

গালের কিনারে রক্ত জমানো
মানুষের নয়, গোলার চুমা।
মায়েদের বুকে কাল ছিল এরা
আজ কে বলিবে—"খোকন ঘুমা" ?

চুল পুড়ে ছাই;—বিক্ষত দেহ,
লাল ছিল ঠোঁট,—নীলাভ আজ;
থেমে গেছে ঝড় নাৎসীরা জয়ী !
গর্বিত পায়ে কুচ্‌কাওয়াজ।

আজ-কাল

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

ইংরেজ তো সত্যনিষ্ঠ, গণতন্ত্রে ব্রতী।
জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে তবুও বিপদ।
রেডিয়ো ঘোষণা করে ইংরেজের ক্ষতি
যদি হয়, দুনিয়ার লুপ্ত ভবিষ্যৎ।

এদিকে কাগজে দেখি নিয়োগ-বদলি,
বিজ্ঞাপনে খুঁজি ঠেসে কোথা কর্ম্মখালি।
দ্বারে-দ্বারে কাটে কাল, ঘুরি অলিগলি,
যদি জোটে কেরাণী কি বীমার দালালী।

ধর্ম্মঘট সুরু ফের ঝাড়ুদারদের।
দুর্গন্ধের মাঝে আসে শারদীয় দিন।
সিভিকগার্ডের হাতে ভার অ্যারেস্টের ?

ডিফেন্স আইনে ক্রমে সহর মলিন।
সূর্য্যাস্তের শেষ রশ্মি পড়ে চরাচরে,
সঙ্গে সঙ্গে নিস্প্রদীপ ব্যবস্থা নগরে॥

জিজ্ঞাসা

কমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাকি আর কী রেখেছ, হে বন্ধু, হে পরম আত্মীয় ?
নিশ্চেতন মনোরাসে আলোক প্রদীপ্তি নাহি আর,
আমারে ঘিরিয়া জাগে প্রাণহীন নির্ব্বাক আঁধার,
অনামার অন্তরাল থেকে মোরে টানিয়া তুলিয়ো।

জানিতে চাহিলে কেহ বিনা প্রতিবাদে জানাইয়ো,
ব'লে দিয়ো : কী কারণে হ'য়েছিল মানস-বিকার,
ভুলাইয়া দিয়াছিল পরিচয় তোমার আমার,
হ'য়েছিল অকারণে হলাহল প্রেমের অমিয়।

কথার নির্ঝর তব কল্লোলিয়া পুলক প্রবাহে
চলুক অনন্ত পানে তার সাথে মোর নামটীও
ভেসে যাক সীমাহীন অকুলের মিলন মাগিয়া।

শষ্প-হীন বনস্পতি শাখে ব'সে পাখী তবু গাহে,
শীতের জড়ত্ব থাক্‌, বসন্তের গীতি শুনাইয়ো।

স্মৃতি বলো, প্রেম বলো,—কী রেখেছ আমার লাগিয়া ?

প্রাকৃতিক

(উপন্যাস)

প্রথম খণ্ড : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সরোজকুমার মজুমদার

তিন বছর আগেকার একটা গল্প বলি শোন।

ডিস্ট্রীক্ট্ বোর্ডের বাঁধান সড়ক দিয়ে দুজন হেঁটে চলছিলো। একটি পুরুষ ও অপরটি নারী। তখনও সূর্য্যাস্ত হ'তে বেশ খানিক বাকি আছে; কিন্তু এরই মধ্যে গ্রামের পথ হঠাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। বড় রাস্তার গা দিয়ে বেড়িয়ে গেছে সরু একফালি একটা গলি। মোড়ের মাথায় প্রকাণ্ড একটা বটগাছ দাঁড়িয়ে আছে। গাছের পাতার সবুজ রংএর ভেতর দিয়ে এখানে সেখানে অসংখ্য লাল ফল উঁকি মারছে—অনেকগুলো ফল ফেটে নীচে প'ড়ে গেছে। ভিতরটা ঈষৎ শাদা, ঈষৎ হল্‌দে।

এখানে, মোড়ের কাছে, এসে ছেলেটা সঙ্গিনীকে শুধোলো,—এখানকার কী দেখতে চাও তুমি? প্রান্তরের পর প্রান্তর সবুজ ধানের ক্ষেত, আম-বাগান, বকুল ফুলের সমারোহ, অফুরন্ত শ্যামলিমা পাওয়া যাবে সোজা এই পথে এগিয়ে চ'ললে। আর যদি নদী দেখতে চাও, পদ্মার উচ্ছল জল-তরঙ্গের বিপুল ঐশ্বর্য্য—তবে এই সাঁকো পেরিয়ে গলি বেয়ে আমাদের চ'লতে হবে কিছুটা। সোজা যাবে?

মেয়েটি ব'ললো,—আমি পদ্মাই দেখব। নদীতে সূর্য্যাস্ত দেখার সাধ অনেক কালের। এখন গেলে দেখতে পাবো তো?

নিশ্চয়! মেয়েটিকে নিজের হাতঘড়ি দেখিয়ে ও ব'ললো,—দেখো মোটে সাড়ে পাঁচটা। চারিদিকে গাছ, ঘন বন,—আলো আসবে কোথা দিয়ে! নইলে এখনো ঢের বেলা রয়েছে! চলো।

মেয়েটির হাত ধ'রে আস্তে বাঁশের সরু পুলটা পার করিয়ে নিলে। অপ্রশস্ত গলি দিয়ে ওরা চ'লতে লাগলো সোজা দক্ষিণ দিকে। বাঁদিকে অনেকগুলো বড় বড় গাছ—আম, কাঁঠাল ও লিচুর। এ গাছের পরিচয় আর মেয়েটাকে দিতে হয়না। গ্রামের লোক না হ'লেও এগুলির সাথে ওর পরিচিতি আছে। ডান হাতে সব ছোট ছোট গাছের রাজত্ব, আঁটি-

সাড়, জামালকোটা, কচুর বন, বেতের ঝোপ্। তারই ভেতর দিয়ে দু'একটা ফুলের গাছ মাথা উঁচু ক'রে আছে। ছোট ছোট ফুল—ফিকে গোলাপ রংএর। কিছুদূর চলতেই বাতাসে ভারী মিষ্টি গন্ধ পাওয়া গেল, অগুরুর স্নিগ্ধতা। মেয়েটি চারিদিকে তার কৌতূহলী দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলো। কোথা থেকে এত সুন্দর গন্ধ আসে ভেসে?

ব'ললো, —এটা কী গাছ? এরই ফুলের এমনি চমৎকার গন্ধ নাকি?

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে ব'ললো, হ্যাঁ, চাঁপা ফুলের গন্ধ।

চাঁপা! মেয়েটি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলো,—এতবড় বিরাট গাছ চাঁপা ফুলের? আমি ভেবেছিলাম—

—লতা-টতা হবে না? ছেলেটি উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠ্‌লো,—তাইতো বলি, মাঝে মাঝে এদিকে এসো! চাঁপা ফুল নিয়ে আমরা এত কাব্য করি, কিন্তু তার সম্বন্ধে আমাদের কী দীন ধারণা ছিল দেখ! ক'টা ফুল নেবে কী? এই নাও। চাঁপা ফুলের গন্ধের মত দীর্ঘস্থায়ী গন্ধ আর কোন ফুলেরই নয়। তা জান তো?

মেয়েটি দু'হাত ভ'রে ফুলগুলি নিয়ে তাদের আঘ্রাণ ক'রলো।

আবার ওরা দু'জনে চ'লতে সুরু ক'রলো। একটা প্রকাণ্ড জাম গাছের নীচে অসংখ্য শুক্‌নো পাতা প'ড়ে আছে। ওদের পায়ের চাপে সেগুলো মর-মর শব্দে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। মেয়েটির চোখের সামনে দিয়ে একটা সাদা রংএর জীব বিদ্যুৎ গতিতে এদিক থেকে ওদিকে তালশুঁক গাছের ঝোপের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছেলেটি ওর ডান হাতে মৃদু আঘাত ক'রে বললো,—ওই দেখ খরগোস। আমাদের দেখে ওর আতঙ্কের সীমা নেই।

এবারে মেয়েটি কৃত্রিম কোপ প্রকাশ ক'রে বললো,—আপনি কী ভাবেন আমাকে বলুন তো। খরগোসও কি আপনাকে চিনিয়ে দিতে হবে?

—উঁহু, পাগল! সবই তো তুমি জানো। ছেলেটি একটু পরিহাস ক'রলো।

একটা অশ্বত্থ গাছের মূলে বিরাট একটা কাঠের মূর্ত্তি খাড়া করা আছে। ছোট ছেলে মেয়েদের যে রকম কাঠের পুতুল থাকে, জগন্নাথের মত চ্যাপ্টা মুখওয়ালা, দেখতে তারই একটা অতি বৃহৎ সংস্করণ। কোন দেব মূর্ত্তি হবে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। মূর্ত্তিটির সমগ্র মুখ-মণ্ডল সিন্দূর দিয়ে রাঙা করা আছে।

অশ্বত্থ গাছের পশ্চাতে বিধ্বস্ত একটা কোঠা বাড়ীর সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখা যায়। অনেকগুলো ইটের, অধিকাংশই ভাঙা, স্তূপ কোনটা দেওয়ালের অংশ, কোনটা বারান্দার; এখানে ওখানে দু' একটা তীর-বরগার ভগ্নাবশেষও দেখা যায়।

ছেলেটি বললো,—দেবমূর্ত্তিটি কার জানো? শুনলে আশ্চর্য্য হবে, ইনি ভগবান বিশ্বনাথ—আমরা, এ-গাঁয়ের এবং এ-অঞ্চলের সবাই, এঁকে বুড়োশিব ব'লে জানি। এঁর ক্ষমতা অসাধারণ। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন এঁর নিত্য কর্ত্তব্য। কায়-মনোবাক্যে তুমি বুড়োশিবের কাছে কিছু প্রার্থনা ক'রলে তোমার মনস্কাম পূর্ণ হবেই—তেমনি সামান্য অপরাধ, এমনকি আকস্মিক বিন্দুমাত্র ত্রুটি কি অসম্মান ক'রলে উনি তা কিছুতেই ক্ষমা ক'রবেন না—সে হতভাগ্যের নিপাত হবে অবশ্যম্ভাবী।

মেয়েটি ভীত দৃষ্টিতে বুড়োশিবের লাল টকটকে দুই গোল চোখের দিকে চেয়ে রইলো। কী অন্তর্ভেদী দৃষ্টি! ওর চোখ নীচু হ'য়ে গেল আপনা হতেই।

ছেলেটি ব'ললো,—এঁর এখানে প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এক অভিনব ইতিহাস আছে। শোনো :—

ওই-যে একটা বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখচো—ওটা ছিল গ্রামের ছোটখাট এক জমিদার বাড়ী। জমিদার ব্রাহ্মণ ছিলেন। তার কোন কিছুতেই অভাব ছিলনা,—কেবল ছিল সন্তানের অভাব! জমিদারগৃহিণী পর পর তিনটী সন্তান প্রসব করেন। কিন্তু পরমায়ু নিয়ে আসেনি তাদের কেউই। কেউ মারা গেছে ছ-বছরের হ'য়ে, কেউ দু-বছরের আবার আর একটি বুঝি ভুমিষ্ঠ হবার তিন মাসের মধ্যেই মৃত্যু বরণ ক'রেছে।

জমিদারবাবু, রামনারায়ণ চৌধুরী, গৃহিণীকে অনেক টোট্‌কা টুট্‌কী খাওয়ালেন, দেশ-বিদেশ থেকে সাধু-সন্ন্যাসী এসে তাঁদের দু-জনকে সোনা-রূপা-তামার রকমারি মাদুলী ধারণ করিয়ে দিলে।

মেয়েটি এখানে প্রশ্ন ক'রলো,—যা'তে ছেলে হয় সেইজন্যে?

– হ্যাঁ! এবং হ'লে যা'তে তার অকাল মৃত্যু না হয়। তারপর ঘটনাচক্রে একসময় জমিদার-গৃহিণী চতুর্থবার সন্তানসম্ভবা হ'লেন। ডাক্তার-বদ্যি, যোগী-ঋষীকদের ভীড় লেগে গেল জমিদার বাড়ীতে।

সন্তান যেদিন জন্মালো তার আগের দিন রাত্রে রামনারায়ণ-গৃহিণী স্বপ্নে দেখলেন, এক পরমাসুন্দরী দেবকন্যা তাঁর শিয়রে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখের স্বচ্ছ হাসিতে চারিদিকের অন্ধকার পালিয়ে গেল। দেবীর কোলে গণেশ ব'সে আছেন; শুঁড় দিয়ে মা'র গলা জড়িয়ে ধ'রেচেন। ভগবতী শান্তস্বরে ব'ললেন,—আমি তোর কোলে কাল আসবো। চিরদিন থাকবো তোদের কাছে, কিন্তু আমাকে কখনও কোন কটু-কথা ব'ললে আমার সহ্য হবেনা। তোর কোল অন্ধকার করে পালিয়ে আসবো। ব'লে তিনি ওর দুই চোখের ওপরে তাঁর গোলাপী ঠোঁট স্পর্শ ক'রে—বাতাসের মাঝে মিলিয়ে গেলেন। চণ্ডীমণ্ডপে আরতির

বাজনা বেজে উঠতেই গৃহিণী জেগে উঠলেন। আনন্দ, বিস্ময় এবং আতঙ্কে ঘরের চারিদিকে ব্যাকুলভাবে চেয়ে রইলেন কার দর্শন পাওয়ার মানসে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হ'য়ে এসেচে। জমিদার গৃহিণী তেমন সময় একটি সামান্যা সুন্দরী কন্যা প্রসব ক'রলেন। উপস্থিত সকলে সবিস্ময়ে দেখলে মেয়েটার দক্ষিণ অঙ্গ দুধে আলতার মতো উজ্জ্বল কিন্তু বাম অঙ্গ ঈষৎ নীলাভ। চন্দনের মতো সুন্দর গন্ধে ঘরের বাতাস মনোরম হ'য়ে উঠলো।

কালের গতির সাথে সাথে মেয়ে বড় হ'তে লাগলো। বাপ-মা সাধ ক'রে নাম রাখলেন আনন্দময়ী। আনন্দময়ী দুরন্ত বালিকা, মৃগশিশুর মত চঞ্চল। পৃথিবীর কোন লোক কোনদিন তাকে তিরস্কার ক'রতে পারেনি। গাল-মন্দ তো দূরের কথা। ক্রমে সে অবাধ্য হ'য়ে উঠলো। অতিরিক্ত আহ্লাদে ও প্রশ্রয়ে আনন্দময়ীর স্বভাব কর্কশ হয়ে উঠলো। মুখের তার লাগাম ছিলনা। তার অমানুষিক স্বেচ্ছাচারে দাসদাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো।

—দেখো হোঁচট খেয়ো না—এধার দিয়ে এসো।

—আনন্দময়ী এতদিনে চোদ্দ বছরের হয়েছে। ইতিমধ্যে কিছুদিন আগে ওর মা মারা গেছেন।

কি-যেন কথায় কথায় আনন্দময়ী একদিন রামনারায়ণের সঙ্গে কলহ ক'রতে ক'রতে মৃতা জননীর সম্বন্ধে এক ইতর বিশেষণ প্রয়োগ ক'রলে। রামনারায়ণবাবুর অন্তর স্ত্রীর বিরহে ব্যাকুল ছিল। তিনি নিজেকে সংযত ক'রতে পারলেন না। পা থেকে তালতলার চটি খুলে মেয়ের গালে ঠাশ ক'রে আঘাত ক'রলেন। আশ্চর্য্য ঘটনা দেখ, পরদিন সকালে রামীর মা আনন্দময়ীর ঘুম ভাঙাতে গিয়ে দেখে তার দেহ শীতল হ'য়ে গেছে মৃত্যুর হিমে।

রামনারায়ণ তারপর থেকে উন্মাদের মতো হ'য়ে গেলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে এ-পথে লোক চলাচল একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেল। জমিদারের বাড়ীতে একটিও লোকের নামমাত্র নেই অথচ এ-বাড়ীর মধ্যে থেকে নাচ গান বাজনার আওয়াজ আসে দুপুর বেলায়। আর রাতের বেলায় কতগুলো লোকের করুণ ক্রন্দন বাতাস মথিত ক'রে ভেসে দূরে চ'লে যায়। সেই আর্ত্তনাদের শব্দে মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে যায় আশে-পাশের বাড়ীর নিদ্রিত লোকদের। জমিদারের জনশূন্য প'ড়ো বাড়ী থেকে শকুন ও পেঁচা ডেকে ওঠে বিকটভাবে। সঙ্গে সঙ্গে পৈশাচিক স্বরে কা'দের সমবেত কণ্ঠস্বর শোনা যায়—হাঃ! হাঃ! হাঃ! হিঃ! হিঃ! হিঃ! ওঃ!

সূর্য্যাস্তের পর ও বাড়ীর ত্রিসীমানা দিয়ে কেউ চ'লতে পারত না। যদি কেউ ওদিক পানে কোনদিন গেছে তো সে আর ফিরে আসেনি।

রজনী মালাকর পূর্ণিমার রাত্রে জানালা দিয়ে চেয়ে দেখে রাত্রি প্রায় দশটার সময়

বিষণ গোয়ালা ও-পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। এই অশথ তলায় আসতেই কার অদৃশ্য হস্ত ওকে গাছের উপরে টেনে তুলে নিলো। তারপরে কোনদিনই কেউ বিষণ গোয়ালাকে গ্রামে দেখতে পায়নি।

প্রেতাত্মাদের অত্যাচারে যখন গ্রামের অনেকেই পৈত্রিক ভিটে ছেড়ে দেশান্তরে চ'লে গেলো। তেমনি সময় কয়েকজন নিষ্ঠাবান প্রাচীন লোক স্বপ্নে একই রাতে বুড়ো শিবের আদেশ পেলেন। গ্রামবাসীরা যদি এখান থেকে তিন মাইল দূরে তালাইমাড়ি শ্মশান ঘাটের পাশে ধুতুরা গাছের ঝোপের ভিতর থেকে বুড়ো শিবের মূর্ত্তি নিয়ে এখানে প্রতিষ্ঠিত করে তবে তাদের আর কোন ভয়ের কারণ থাকবে না। সেই থেকে বাবা বুড়োশিব এখানে নিয়মিত পূজিত হ'চ্ছেন। সত্যিই কিন্তু এঁর কল্যাণে আর কোন অস্বাভাবিক উৎপাত হয় না। এঁর উদ্দেশে প্রণাম করো।

মেয়েটির গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিলো। বুকের মধ্যে দ্রুত স্পন্দন হ'চ্ছে। সভয়ে সে বুড়োশিবের দিকে চেয়ে মাথা নমিত ক'রলো।

ওদের সরু রাস্তা এসে একটা মাঠের গায়ে মিশে গেছে। মাঠের মধ্য দিয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট পথের চিহ্ন নেই। বরং সারা মাঠটায় খালি ছোট ছোট গুল্মই দেখা যায় অগুন্তি। তবুও ওরা মাঠের ওপর দিয়েই যাবে, এটাই নাকি তাদের নদীতে যাবার সহজ রাস্তা। মাঠের ডানদিকে একটা জলা দেখা যায়। জলের রং চারিদিকের প্রকৃতির মত ঘন সবুজ। জলের ওপরে ভেসে আছে গোল গোল বড় বড় পাতা—দেখতে ভারি সুন্দর, আর অনেকগুলো পদ্ম ফুল। রাঙা, শাদা ও সবুজের সুন্দর সমারোহ।

ছেলেটি ব'ললো,—এইটেই আমাদের গ্রামের পদ্মপুকুর। ছেলে-বেলায় যখন স্কুলে প'ড়তাম তখনকার কথা বলি শোন। আমরা তখন মোটে দশ এগারো বছরের। পূজোর ছুটি, সাত আটজন এসেছি—পদ্ম তুলতে প্রায় সন্ধ্যার সময়। পরের দিন ক্লাশ সাজাবো ব'লে। দলের মধ্যে সবচেয়ে ওস্তাদ ছিল নবীন বলে একটা ছেলে—নিয়োগী বাড়ীর। ওই নাব্‌লো পুকুরে পদ্ম তুলতে। দু'চারটে ক'রে ফুল তুলে তুলে নবীন পাড়ে ফেলে দিচ্ছে আর আমরা সেগুলো বেশ ক'রে গুছিয়ে রাখচি। এদিকে চাদ্দিকে তো অনেকটা গাঢ় অন্ধকার হ'য়ে গেছে। পচা আমার গা টিপে আস্তে আস্তে ভীতস্বরে ব'ললে,—কেমন আঁশটে আঁশটে গন্ধ পাচ্ছিস্ না?

সত্যিই যেন কেমন কেমন একটা উৎকট গন্ধ পেলাম। ফিস্ ফিস্ ক'রে নিতাইকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম। নিতাই তো ভয়ে আমাকে একেবারে জাপটে ধরলো। এমন সময়, ওই যে কলাগাছগুলো দেখছো না, ওরই পাশে জ্বল জ্বল ক'রছে, সভয়ে দেখলাম একজোড়া,

চোখ—সঙ্গে সঙ্গে হুম ক'রে একটা বিকট গর্জ্জন। আমাদের তখন তো একেবারে খাঁচাছাড়া অবস্থা, কী করি কোথায় যাই। সবাই মিলে জড়াজড়ি ক'রে পুকুরের মধ্যে ওই ওখানটায় ঝাঁপিয়ে প'ড়লাম, তারপর—

বাধা দিয়ে মেয়েটি ব'ললো,—এদিকে বাঘ আছে নাকি? অ্যাঁ! ওর অমন চমৎকার মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো আতঙ্কে। ছেলেটির আরো কাছে স'রে এসে ঘন হ'য়ে দাঁড়ালো। অনুনয় ক'রে ব'ললো,—তবে ফিরি চলুন। অন্ধকার হ'য়ে গেছে। আর একদিন বেলা থাকতে থাকতে পদ্মা দেখবো। চলুন। ব্যগ্রভাবে ও ছেলেটির হাত আকর্ষণ ক'রলো।

ছেলেটি আর একবার হেসে ফেটে পড়লো,—উঃ! কি ভিতু তুমি! বাঘ আছে না ছাই। বানিয়ে বানিয়ে একটা গল্প ব'ললাম। মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখলো, সে তখনো আশ্বস্ত হয়নি। ওর হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললো,—চলো, চলো পদ্মা দেখবে। সত্যি বলচি এদিকে বাঘ তো একেবারেই নেই, বাঘের মাসীকেও পাবেনা। আর যদিই-বা বাঘ আসে তাতেই বা ভয়ের কি আছে? আমি আছি কী করতে? পারবোনা আমি তোমায় বাঁচাতে, বাঘের কবল থেকে?

মেয়েটি ছেলেটির প্রশস্ত বুকের দিকে চেয়ে বোধ হয় একটু নিশ্চিন্ত হ'লো। ওরা নিঃশব্দে এগিয়ে চ'ললো। ছেলেটির হঠাৎ একটা কথা মনে প'ড়ে গেলো, ব'ললো,—ছেলে বেলায় আমি কেমন বোকা ছিলাম শুনবে তুমি? কী একটা কথায় কথায় আমার এক বন্ধু ব'লেছিলো যে, সে স্পষ্ট দেখেচে যে পদ্মা থেকে একটা বড় মাছ উঠে এসে টপাটপ একটা ঝাউ গাছে উঠে গেল। আমি বন্ধুটির গালে একটা ছোট চড় বসিয়ে ব'লেছিলাম, দূর গাধা, মাছ কি গরু যে গাছে চ'ড়তে পারবে? অর্থাৎ গরু হ'লে পারতো, মাছ কিনা তাই পারে না।

মেয়েটি রেগে উঠলো,—অসম্ভব! বাজে কথা। আপনি কখখনো বলেননি। শুধু শুধু—।

ছেলেটি আর একবার হেসে উঠ্‌লো। হাসির রেশ থাকতে থাকতেই ব'ললো,—বিশ্বাস করো, সত্যি—

ওরা মাঠটা প্রায় পেরিয়ে এসেছে। সমুখেই মাঠের সীমানায় সারিবদ্ধ ভাবে অনেকগুলো দেবদারু গাছ দাঁড়িয়ে আছে। গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে অস্পষ্ট দেখা যায় অনেক-গুলো গাছ, অনেকটা মেঘের মতো। ওগুলো বোধ হয় তিন চার মাইল দূরে।

ছেলেটি ব'ললো, এই দেবদারু বনের পরেই পাবে তোমার ঈপ্সিত পদ্মা, দূরের ঐ আবছা গাছগুলো ওপারের।

সরু পথ দিয়ে লতানো গাছের ছড়ানো ছিটানো কাঁটা বাঁচিয়ে ওরা পদ্মার বালুতটে এসে দাঁড়ালো।

—ওই দেখ! এখনো সম্পূর্ণ অস্ত যায়নি।

ছেলেটির দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে মেয়েটি পশ্চিম দিকে চেয়ে দেখলো। প্রকাণ্ড লাল থালার মতো সূর্য্য খানিকটা জলের মধ্যে ডুবে গেছে—খানিকটা বাইরের আকাশে আছে। লাল ও গোলাপী রংএর সমন্বয়ে আকাশ আর পদ্মার জল অপরূপ রূপ ধারণ ক'রেচে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়েটি ওদিকে চেয়ে রইলো। ব'লে উঠ্‌লো,—আঃ! অভিনব! স্বর্গীয়! আপনি ক্যামেরাটা আনলেন না কেন বলুনতো সঙ্গে ক'রে?

ছেলেটি এ-প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে ব'ললো,—কলকাতার গঙ্গায় সূর্য্যাস্ত এত সুন্দর হয় না কেন জান তো? ওখানে গঙ্গার গতি উত্তর থেকে দক্ষিণে। নদী একরকম পূব থেকে পশ্চিমে বা পশ্চিম থেকে পূবে না চ'ললে সূর্য্য বা সূর্য্যাস্ত বিন্দুমাত্রও তৃপ্তিদায়ক হয় না।

ওরা জলের ধারে ব'সলো। উচু-উচু স্রোত ছল-ছলাৎ শব্দে পাড়ে আছড়ে প'ড়ছ। মেয়েটি জলের আরো ধারে এসে পদ্মার ঘোলাটে জল নিয়ে বালিকার মতো কিছুক্ষণ খেলা করলো।

বললো,—এত সুন্দর আমার লাগচে। এখান থেকে আমার যেতে কিছুতেই মন সরছেনা। বাবাকে লিখে দিন—আমি আরো কিছুদিন এখানে থাকবো।

এই প্রায়ান্ধকার নদীতটে ব'সে সেদিন এক অসংযত মুহূর্ত্তে ছেলেটি মেয়েটির গোলাপী কপোলে অকস্মাৎ গভীর ভাবে একটি চুম্বন এঁকে দিয়ে সহজ ভাষায় ব'লেছিলো, সে তাকে ভালবাসে। তারপর অসীম আগ্রহ সহকারে মেয়েটির কোমল করপল্লব দুটি নিজের কঠোর হাত দিয়ে চেপে ধরে বুকের কাছে এনে কম্পিত স্বরে প্রশ্ন ক'রেছিলো সেও তাকে ভালবাসে কিনা। মেয়েটি তার কোন জবাব দিতে পারেনি। শুধু ছেলেটির দৃঢ় মুষ্টির মধ্যে তার হাত দুটি একটু কেঁপে উঠেছিলো।

এ-দৃশ্য দেখেছে একমাত্র পদ্মা—নিজের দ্রুত গতির তালে চ'লতে চ'লতে সে একবার এদিকে চেয়ে দেখেছিলো। আর মাথা উচু করে উঁকি দিয়ে দেখেছিলো বোধ হয় দূরের ঐ বটগাছগুলি।

ছেলেটিকে তোমরা দেখেছো—তার নাম প্রকাশ। মেয়েটিকে আমরা শীলা ব'লেই জানি।

ক্রমশঃ
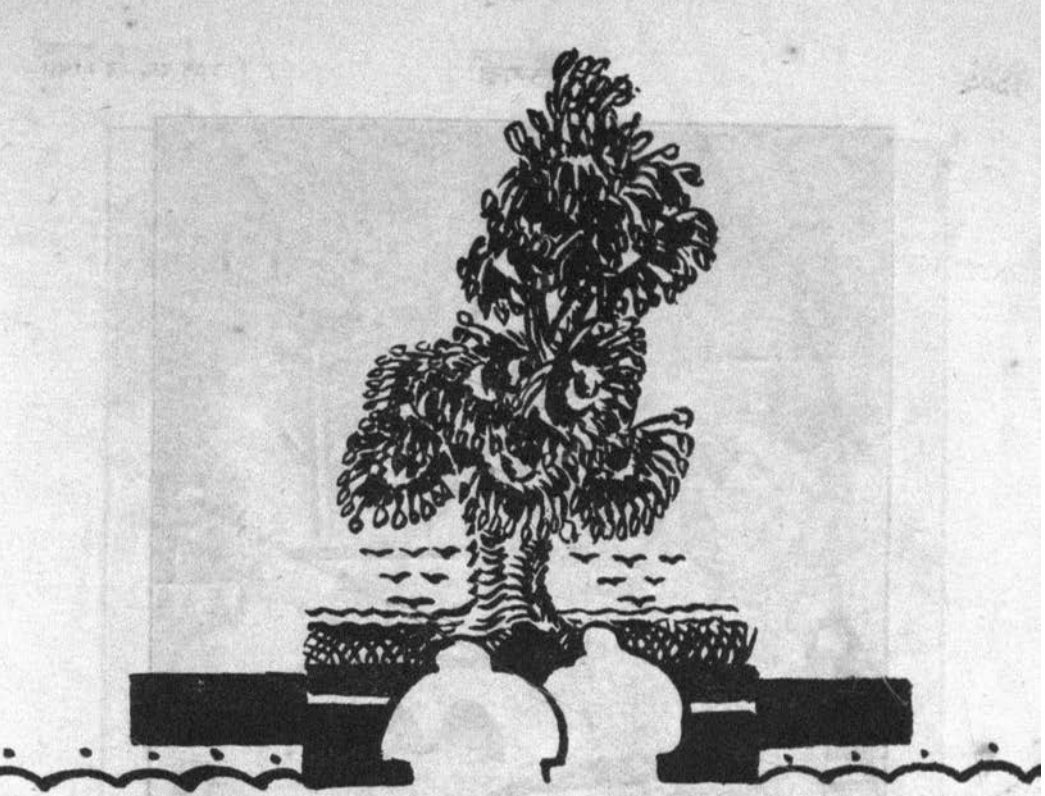
কলা-ভবন

গত সংখ্যায় এই বিভাগের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে প্রকাশ ক'রেছি। পুনরুক্তি যদি দোষের না হয়, তাহ'লে পুনরায় বলা চলে যে আমরা শিল্পী জাতিকে দু'ভাগে ভাগ ক'রে রাখতে চাই ঃ প্রথম, যাঁদের চিত্র সুধুমাত্র বর্তমানের জন্যে ; দ্বিতীয়, যাঁদের চিত্র অদ্যকার ও আগামী কালের জন্যে। আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্রকারের সৃষ্টি-বিষয়ে আগ্রহান্বিত ঃ এ বিভাগে কেবলমাত্র তাঁদেরই প্রবেশাধিকার থাকবে।

এখানে যে সব ছবি ছাপা হ'চ্ছে, তা অনেকের কাছে অদ্ভুত বা অসমঞ্জস ঠেকতে পারে ঃ অনুগ্রহপূর্বক তাঁরা এ-ছবি না দেখলে বাধিত হ'বো। শিল্প-রস গ্রহণের ক্ষমতা লাভ করতে হ'লে পরিপূর্ণ পরিমাণে মস্তিষ্ক থাকা দরকার এবং তার উপযুক্ত পরিচালনা দরকার। চিত্রের ভাষা আছে, তা যদি কেউ বুঝতে না পারে, সে-দোষ অবশ্যই চিত্রের নয়। কিন্তু হাসির কথা এই যে উচ্চ শ্রেণীর চিত্র চিরকাল নিম্নশ্রেণীর দর্শকের কাছে কটূক্তি শুনে আসছে। বর্ণপরিচয় হওয়ার আগেই মহাকাব্যের অক্ষরে অক্ষরে ত্রুটি খুঁজে বা'র করা যেমন উপহাসের বিষয়, এই সব চিত্র-সমালোচকের স্পর্ধিত উক্তিও তেমনি হাস্যকর।

এবার শিল্পী শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় আমাদের গত সংখ্যার আমন্ত্রণে যে-প্রবন্ধটি পাঠিয়েছেন, এ-বিভাগে তা প্রকাশ করলাম।

LANDSCAPE প্রাকৃতিক দৃশ্য by PAUL KLEE

PAUL KLEE ১৮৭৯ সালে স্থইজারল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। মিউনিকে ইনি লাভ করেন প্রথম কলাবিদ্যা শিক্ষা। তারপর ইটালিতে গিয়ে ইনি গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত হন্ Byzantine শিল্প দ্বারা। তারপর যুগ এলো অনুসন্ধান, অন্বেষণ আর আবিষ্কারের। এই সময় তিনি সসম্ভ্রমে স্বীকার ক'রেছেন,—James Ensor, Van Gogh এবং Cezanneর প্রভাব প্রতিফলিত হ'য়েছিলো তাঁর ওপর। ১৯১১তে তিনি Blame Reiter দলে যোগ দেন্। Picasso এবং Matisseই Kleeর পরবর্তী শিল্প সৃষ্টির উন্নতির জন্য দায়ী। Kleeই সম্ভবতঃ একমাত্র জার্মাণ শিল্পী, যাঁর প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্যারী পর্য্যন্ত বিস্তৃত।
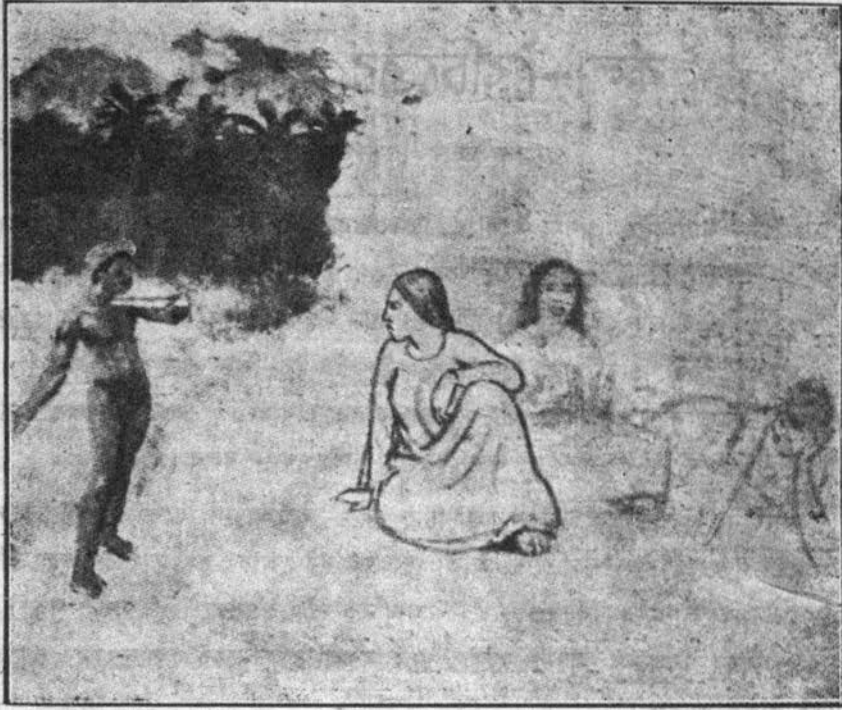
TAHITIAN STUDY by GANGUIN

PAUL GANGUIN (১৮৪৮-১৯০৩) শিল্পকলার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন Camille Pissaroর কাছে থেকে। তার কিছুদিন পরেই ইনি Van Goghর সঙ্গে হন মিলিত। কিন্তু এ-মিলন সুখের হ'লোনা। কারণ এই দুই শিল্পীর লক্ষ্য ও অনুভূতি এক নয়। Van Gogh চাইতেন, তিনি তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করবেন মানুষের বেদনার ও ঘাত-প্রতিঘাতের দিকে শাণিত দৃষ্টিক্ষেপ ক'রে, আর Ganguin ছিলেন ঠিক বিপরীত মতবাদী। তিনি মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা ভুলে নিজে বিচরণ করতে চাইতেন মধুময় সুখময় সাম্রাজ্যে। তারপর Van Goghর যখন মানসিক বিকার উপস্থিত হ'লো তখন Gauguin Brittanyতে চ'লে গেলেন।

১৮৯১ সালে ইনি Tahiti অভিমুখে যাত্রা করেন এবং আদিম মানবের চিত্র আদিম রীতিতে আঁকার ইচ্ছা পূরণ করেন। এঁর Tahitian ছবিগুলি বিদেশীয় বিষয়ে অঙ্কিত হ'লেও দেশের সাধারণ কল্পনা-বিলাসীদের মনে দাগ দিতে পেরেছিল, যদিও সর্বসাধারণের কাছে এই ছবিগুলির পরিচয় ঘটে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে শিল্পীর মৃত্যুর পর।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে Ganguin পুনরায় প্যারী নগরে ফিরে এসেছিলেন, সে শুধু মাত্র চিত্রের নূতন পদ্ধতি আবিষ্কারক হ'য়েই নয়, জীবনের ও শিল্পের প্রতি নবতর এক অনুভূতি নিয়ে।

কলা-বৈচিত্রের প্রভাব

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

মাসিক নাচঘরের প্রথম সংখ্যায় "কলাভবনের" মধ্যে বিশেষত্ব আছে। এই পরিচ্ছেদে সম্পাদক "কলাভবনে"র বিষয় বস্তুর কথা ব'লতে যা ব'লেছেন তা লক্ষ্য করবার বিষয়। কিছু নূতন গড়তে আন্তরিক চেষ্টা যেখানে আছে, উদ্দাম নবীনতার গৌরব যদি তার মূলে থাকে, হয়ত তার ভাষা দীপ্ত, উদ্দীপনাপূর্ণ অথবা কিছু তীব্র হয়েই যায়। আমরা লেখকের সৎ-উদ্দেশ্য বুঝে যথাসম্ভব তাঁকে সমর্থন করতে বাধ্য। সুতরাং উদ্দেশ্য সাফল্যের কামনা নিয়ে এ বিষয়ে যেটুকু এতকাল ধরে দেখেছি তাই এখানে বলব।

নাচঘরে 'কলাভবনে' যে সকল চিত্র নিয়ে আলোচনা হবে তা মোটেই সাধারণ নয়;—অর্থাৎ গতানুগতিক পদ্ধতিতে আঁকা ছবিও নয় আর তা সাধারণ কলা রসিক বা আর্ট-কৃটিকের সমালোচনার বিষয়ও নয়। আধুনিক যুগে ইউরোপে যে সকল পদ্ধতি চিত্র-জগতে এক বিষম বিপ্লবের সূচনা করেছে সেই সকল চিত্র নিয়েই কলাভবনের আলোচনা। তাই নিয়েই প্রথম আরম্ভ।

এ সম্বন্ধে এখানকার সাময়িক পত্রিকার মধ্যে এ নিয়ে পূর্বে হয়ত রীতিমত, ধারা-বাহিক ভাবে আলোচনা হয়নি, তবে মনে হয় মাঝে মাঝে একাধিক পত্রিকায় কিছু কিছু আলোচনা দেখেছি। পোষ্টইম্‌প্রেসনিজম্ বা ফিউচারিজম্ অথবা কিউবিজ্‌ম্ নিয়ে এদেশের সাহিত্যে বা সাধারণের মধ্যে ভাল ক'রে আলোচনা না হ'লেও নানা পত্রিকায় কয়েক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আধুনিক বিপ্লবপন্থী শিল্পীর কাজের ছাপা-নকল আমরা দেখবার সুযোগ পেয়েছি, যার মধ্যে সম্প্রতি নিকোলাস্ রোরিকের কথা বিশেষ মনে পড়ে—তাঁর এমন অনেকগুলি কাজের পরিচয় আমরা পেয়েছি যার মধ্যে আধুনিকতার যতগুলি ইজ্‌ম্ আছে তা বর্ত্তমান। অধিকন্তু সম্প্রতি প্রাচ্য কলার যোগাযোগও তার মধ্যে দেখা গেছে। তারপর—

এখন, সমসাময়িক অথবা আমাদের অগ্রবর্ত্তী লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ শিল্পীদের কারো কারো মধ্যে ঐ সকল পদ্ধতির আলোচনা বা অনুশীলন হয়েছে, এ ক্ষেত্রে সেই কথাই বলবো। প্রথমে সমসাময়িক বা সতীর্থের কথাটাই বলি, কারণ সেটা সকলের আগেই প্রত্যক্ষ করেছি।

১৯২১ সালে একবার নন্দলালের সঙ্গে দেখা করতে তাঁদের হাতীবাগানের বাড়ীতে যাই। ছোট বাড়ীখানির সবটাই নন্দলাল দেখালেন। সদরে ঢুকে গলি-পথ বাঁদিকে

ঘুরেচে—বাঁকের সমুখে দেওয়ালের উপর, একহাত সমচতুষ্কোণ ক্ষেত্রে অপূর্ব্ব এক গণেশ মূর্ত্তি। ব্যাস্ রিলিফ, মেজে থেকে প্রায় তিন ফুট উঁচুতে রাখা আছে। কাজটা নন্দলালের নিজের, ফিউচারিস্ট ষ্টাইলে গড়া। তখন দেখলাম, নন্দলালের অধ্যবসায় এবং অভিনিবেশ শুধু ভারতীয় পদ্ধতির মধ্যেই আবদ্ধ নয়, জগতের বৈচিত্রময় কলা-প্রবাহের সাথেও তার সম্বন্ধ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তার কোন প্রতিকৃতি নেই, আর এখন তার কোন চিহ্নই নেই, কেবল সেই মাপের ঘাটালটি বর্ত্তমান আছে।

তার পরেই দেখি, কিছুদিন পর গগনেন্দ্রনাথের কিউবিজম্ আরম্ভ হয়ে গেল। সবাই জানেন আগে তিনি বেশীর ভাগই ল্যাণ্ড্স্কেপ্ আঁকতেন। ভারতীয় চিত্রকলায় তাঁর নৈসর্গিক ছবির অবদান অসামান্য এবং অসাধারণ। তাঁর বিশিষ্ট পদ্ধতি জাপানি পদ্ধতির সঙ্গে মিলে ভারতীয় কলার এক অভিনব রূপ সম্পদ দিয়েছে। তখনও ঠাকুর-বাড়িতে জাপানি প্রভাব ছিল।

গগনেন্দ্রনাথ যেখানে গিয়েছেন সেই স্থানের নানা দিক অপরূপ মূর্ত্তিতে ফুটিয়েছেন। দার্জ্জিলিং গেছেন, সেখানকার পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্য, তুষার শ্রেণীর রূপ নানা ভাবেই দেখিয়েছেন। পুরীর সমুদ্র তাঁর অনির্ব্বচনীয় রূপ রসে সমৃদ্ধ। রাঁচি গিয়েছেন,—সেখানকার বৈশিষ্ট, চমৎকার বর্ণ-বিন্যাসের বৈচিত্র ছোট ছোট কার্ডের মধ্যে ধরে আমাদের পাঠিয়েছেন। নৈসর্গিক ছবিতে তাঁর হাত পাকা। কেমন ক'রে আমাদের সমতল, মাঠ প্রধান বাংলার পল্লী-গ্রামের,—সামান্য জলাশয়ের চারিদিকে ছড়ানো খড়ের ঘরগুলিকে বিচিত্র বর্ণ-সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত ক'রে আমাদের চ'ক্ষের সুমুখে ধরে দিয়েছেন, তা' দেখে অবাক হ'য়ে যাই।

তার মধ্যে আবার ক্যারিকেচার ব্যঙ্গ-চিত্রের প্রবাহ কিছু দিন চলেছিল। সে এক নূতন ধরনের ব্যঙ্গ-চিত্র অথচ সম্পূর্ণ দেশী পদ্ধতির অসাধারণ পরিণতি। এ সকল সাধারণের দেখা।

এই সব নিয়ে মসগুল গগনেন্দ্রনাথ এক দিন (সম্ভবতঃ ১৯২১ বা ১৯২২ সালে) কিউবিজম্ নিয়ে পড়লেন। প্রথমে ছোট ছোট কাজ কালি দিয়ে এক রংএই চলতে লাগল। বিষয়গুলিও সাধারণ, যেমন "মৃত্যু", "পথিক", "একটা নারী", "প্রসাধন" এই সব। দক্ষিণের বারাণ্ডায় ব'সে পরীক্ষার পর পরীক্ষা, অজস্র ত্রিকোণ চতুষ্কোণের কারখানা, আলো ছায়ার মধ্য দিয়ে নানা কোণের বিস্তার। ক্রমে নানা বিষয় নিয়ে কিউবিক্ ছবি আঁকা হতে লাগল। তারপর রং এর বৈচিত্র নিয়ে তখন যে সকল কাজ বেরিয়েছিল তা যেমনি চমৎকার তেমনি অসাধারণ। বোধ হয় কিউবিজমের জন্মস্থানেও জলের রং-এর এমন বিচিত্র সৃষ্টি সম্ভব হয় নি। কিউবিজ্‌মের ছড়াছড়ি—যথার্থ ঠাকুর-বাড়িতে কিউবিজ্‌মের ঝড় বয়েছিল

কিছুদিন। তাঁর সেই সময়কার কাজ অনেকেই পেয়েছেন, কয়েকখানি আমারও পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল, তা এক সময়ে নাচঘরের মধ্যে প্রকাশ করতে চেষ্টা করব।

তাঁর কিউবিজমের উদ্যম নিয়ে তখন বেশ একটা চাঞ্চল্য, শিল্পী এবং সাধারণের মধ্যে পড়েছিল। বাস্তবিকই তখনকার দিনে আমরা সকলেই, Indian Society of Oriental Art এর সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই একটী শক্তি-স্পন্দন অনুভব করেছিলাম। সোসাইটির বায়ুমণ্ডল যেন একটা নবীন উদ্যমে পূর্ণ হয়েছিল। এখন গগনেন্দ্র নাথের কিউবিজ্‌মের অনুশীলন নিয়ে তখন যে সাড়াটা পড়েছিল তার কিছু পরিচয় দেব। এর মধ্যে সব দলেরই যে সমর্থন ছিল তা মনে করে খুসী হবার প্রয়োজন নেই; এর মধ্যেনানা বিরুদ্ধভাবের আবেগ ছিল। শিল্পীর দল আর সাধারণ পৃষ্ঠপোষক বা কল্যাণকামীর দল। তার মধ্যে আবার বিদ্বান পণ্ডিত শিক্ষিত প্রতিষ্ঠাবান খ্যাতনামা লেখক সাহিত্য-সম্পাদক, কলা-রসিক বা আর্ট-কৃটিক্ (যা আমাদের দেশে প্রত্যেকে, যিনি ছবির সমুখে দাঁড়িয়ে ছবির দিকে তাকান) এ সকল নিয়ে এক বড় দল ছিল। এঁদের মন্তব্যগুলি আমি একে একে বলছি।

শিল্পীদের মধ্যে জুনিয়ার একদল তাঁদের মনোগত ভাবটা এই যে,—"অন্ন বস্ত্রের চিন্তা না থাকলে অনেক রকম কিছুই আঁকা যায়"। এ সব কাজ যদি আমরা করতাম তবে হয়তো এখান থেকে পাত্তাড়ি গুটাতে হ'তো। অপর এক সাধারণ পৃষ্ঠ-পোষকের দল বল্লেন যে এটা কোন আর্টই নয়, যা সাধারণের বোধগম্য নয়, যে বিচিত্র পদ্ধতি বুঝতে গেলে বিশেষ শিক্ষার দরকার তাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। বড় লোক খেয়ালের বশে যা আঁকবে তাই যদি আর্ট হয় তা হ'লে আর্টের আভিজাত্য কোথায় রইল। তারপর সামাজিক একদল পণ্ডিত শ্রেণী, তাঁরা ভারতীয় কলার উন্নতিকামী বলে নিজেদের বিশ্বাস করেন, তাঁরা বল্লেন "এ আবার কি! এতদিন লম্বা লম্বা আঙ্গুল, লতানে হাত, ডমরু-মধ্য কটি, লতার মত দেহ, এ সব না হয় কষ্টে সহ্য করা গেল,—কিন্তু এ আবার কি? এ যে উল্টো শ্রী, ট্রিগনোমেট্রা, প্রিস্‌ম্, প্যারাবোলা, হিপারবোলা নিয়ে একি চিত্রকলা পদ্ধতি?" তারপর শিক্ষিত যাঁরা, ঠাকুর-বাড়ীতে যাতায়াত আছে, তাঁরা নাকি এর মধ্যে একটা মহান ভবিষ্যতের সূত্রপাত দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসু সাধারণকে একথা বোঝাতে চাইলেন, যে এই সূত্রে আমাদের শিল্পের গণ্ডী প্রসারিত হ'ল, যার ফলে আমাদের কলা কৃষ্টি মহা প্রসারিত হয়ে বিশ্ব-শিল্প-কলারাজ্যে একটি বিশেষ স্থান আবিষ্কার করবে। ইত্যাদি ইত্যাদি—

আমার ধারনা যাঁরা যথার্থ গগনেন্দ্র নাথের এই নব উদ্যমের কাজগুলি থেকে রস পেলেন তাঁরা কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পী। তার মধ্যে যে শিক্ষিত দলের কেউ ছিলেন না

তা বলা যায় না, সেই দুই একজন মাত্র। আমি জানি, বেশীর ভাগ শিক্ষিত ব্যক্তি যাঁরা সোসাইটীতে ঘন ঘন আসা-যাওয়া করতেন, গগনেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তাঁরা সুমুখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে দায় এড়িয়ে আড়ালে তাঁকে বলেছিলেন, পাগল। নবীন অনেকগুলি শিল্পনবীশ, যাঁদের মধ্যে দায়ীত্বজ্ঞানের কোন বালাই নেই তাঁরা একথা বিশ্বাস করতেন আর বলতেও দ্বিধা করেন নি যে এদ্বারা ইণ্ডিয়ান আর্টের কস্মিন কালেও কল্যাণ হবে না, যেহেতু এর মধ্যে ডেকরেটিভ্ এলিমেণ্ট্ কিছুই নেই। আর ইণ্ডিয়ান আর্ট মূলতঃ ডেকরেটিভ্।

তারপর যখন প্রতি বৎসরের প্রদর্শণীতে কিউবিক্ আর্ট বিক্রী হতে লাগল,—তখনও ভদ্রলোকের এক কথা। "একটা নূতন ঢেউ উঠেছে কিনা, ও থাকবে না, ওসব চলে যাবে।" এই ছিল তাদের প্রবোধ বচন। কিন্তু যথার্থ ব'লতে গগনেন্দ্রনাথের এ উদ্যম বৃথা যায় নি। একদিন শিল্পী এর মধ্যে রস পেয়েছিল। ক্রমে তাদের মধ্যে কেউ কেউ কমার্সিয়াল আর্টে ঐ পদ্ধতি চালিয়ে তাঁদের চিন্তা-শক্তির পরিচয় দিতে আরম্ভ করলেন।

কোথা থেকে কি আসে, আর তার ফলাফল কোন দিকে নিয়ে যায়, কি বস্তু প্রসব করে তা' আগে থেকে কিছুই জানা যায় না যেহেতু ভবিষ্যৎ বিধাতা দুর্জ্ঞয় করে রেখেছেন। আজ দৈব-দুর্ব্বিপাকে যদি গগনেন্দ্রনাথের তুলি বন্ধ না হোত তা'হলে কিউবিজমের মধ্য দিয়ে কি প্রকার সৃষ্টির বিবর্দ্ধনের সম্ভাবনা ছিল কেউ বলতে পারে না। কিন্তু পদ্ধতি আমদানী ক'রে গগনেন্দ্রনাথ আমাদের দেশে, কমার্সিয়াল আর্টের শিল্পীদের সাহস জুগিয়ে প্রকারান্তরে তাঁর পুষ্টি সাধনের সুযোগ করে দিয়েছেন। সাহস যোগানোর কথা এই জন্য বলছি—পাশ্চাত্যের কমার্সিয়াল আর্টে কিউবিজমের ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে প্রচুর, কিন্তু আমাদের দেশে এযুগের বিজ্ঞাপন শিল্পের কৃতকর্ম্মা যাঁরা প্রথম প্রথম তাঁদের দৃষ্টি এতটা প্রসারিত হয় নি, তা ছাড়া সাহসেরও অভাব ছিল। তার উপর পৃষ্ঠপোষক বা অধিকারিরা ঐ পদ্ধতিতে আঁকা ছবি গ্রহণ করতে রাজি হবেন কিনা সন্দেহ; কারণ তখনও বাজারে পুরাণো ছাঁদর বিজ্ঞাপন-শিল্পের ধারা প্রবল ছিল।

এখন গগনেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ সাধারণের দৃষ্টিও প্রসারিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে নানা কৌশলে তা' ব্যবহারের সাহসও এসেছে। এখন যে নানা মাসিক পত্রে প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনার মধ্যে নানা বিখ্যাত বিজ্ঞাপনের অঙ্গে নানা বৈচিত্রে বিভূষিত কিউবিষ্টিক্ এলিমেণ্ট দেখতে পাই তার মূল ঐখানে। বিভিন্ন জাতীয় শিল্প চর্চ্চার ইহাই প্রত্যক্ষ ফল।

গতানুগতিকতার প্রতি বিতৃষ্ণা স্বাস্থ্যের একটা লক্ষণ। অর্থোডক্স্ বা কৌলীন

কালে কালে প'চে ওঠে। প্রকৃতির নিয়মই এ জগতের সকল ভাবী কালে বিকৃত হতে বাধ্য। তখনও সেটাকে গৌরবের সঙ্গে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা ব্যাধিগ্রস্তের লক্ষণ। নূতন কিছু বাইরের উপাদান না নিয়ে, অথবা কোন প্রকার পরিবর্ত্তন না মেনে যদি গতানুগতিক পদ্ধতিকে ধরে আঁকা যায় তাতে শিল্পকলার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

কোন একটি নূতন ভাব, যখন কোন জাতির মধ্যে আসে—তখন প্রকৃতির কল্যাণময় নির্ব্বন্ধে তা উপযুক্ত ক্ষেত্রে এসে পড়ে যার মধ্যে দিয়ে প্রসারের বিস্তৃতির সুবিধা হয়। ভাব যাকে বলছি তার অপর নাম শক্তি। কলা-বিদ্যা এমনই একটা শক্তি যাতে জাতীয় জীবন সমৃদ্ধ হয়। প্রকৃতির মহান দুর্লঙ্ঘ্য এবং রহস্যের মধ্যে ঢাকা নিয়মেই সেই শক্তি জাতীয় জীবনে এমনই একটী আধারের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ হয়, যাতে জাতির সকল স্তরের মধ্যে তা প্রসারিত হবার সুবিধা হয়। কখন প্রকৃতির বিচারে ভুল হয় না। চিত্র-কলার মধ্য দিয়ে এই যে শক্তিটা সম্প্রতি জাতিগত হয়েছে, তার মধ্যে এই নিয়ম ও বৈশিষ্ট বর্ত্তমান। অনেকেই অবাক হয়ে ভাবেন—যে, এত দেশ থাকতে বাঙ্গালাতেই এই কলা-বিদ্যা জাগরণের শক্তিটা এল কেন—আর বাঙলার এত সব বড় বড় বংশ থাকতে ঐ বংশের বংশধরের মধ্যে দিয়েই বা এল কেন—এখনকার দিনে যুগ-ধর্ম্মের মতই ভারতে এই যে কলা-বিদ্যা জাগরণ এসেছে, তা ঐ সকল আধারের মধ্যে দিয়ে না এসে যদি অন্য কোন দিক দিয়ে আসত, বিকল্পের দিকটাই যদি দেখা যায়,—তা'হলে এর গতি ও প্রভাব কি ভাবের হতো তা আমরা বেশ কতকটা কল্পনা করতে পারি।

বাংলা-সাহিত্যে যা ঘটেছে, চিত্র-কলার মধ্যেও তা ঘটাই স্বাভাবিক। যেমন বাংলা-সাহিত্যের টেক্‌নিক, পশ্চাত্যের বিচিত্র পদ্ধতির অনুশীলনের প্রভাবে ও অভিনিবেশের ফলে সমৃদ্ধ হতে প্রেরণা নিয়ে এসেছে, চিত্র-কলার মধ্যেও সেই ভাবে নানা বৈচিত্রের প্রভাবে পুষ্টি এবং সমৃদ্ধি আসবে। সেইজন্য এখানে যতটা বেশী পরদেশীয় পদ্ধতির বৈচিত্র আমাদের দেশের শিল্পীর এবং রসিকসমাজের চোখের সমুখে ধরে দিতে পারা যায় ততই শুভ। স্বাধীন দেশের স্বাধীন চিন্তার ফলস্বরূপ যে সকল উৎকৃষ্ট নিদর্শন তা দেখার সুযোগ আরও সাধারণের ঘটে না। সেটা ঘটিয়ে তুলতে যাঁরা সাহায্য করেন তাঁরা নিশ্চয় ধন্যবাদের পাত্র। পৃথিবীর যে যে দেশ শিল্প বা চিত্র-কলায় সমৃদ্ধ হয়েছে তার মূল প্রেরণা যুগিয়েছেন—প্রকৃতি। প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ট ভাবে না হ'লে কলা-বিদ্যার উৎকর্ষ অসম্ভব। বাহ্য ও অন্তর প্রকৃতির সঙ্গে গভীর পরিচয়ের ফল, শক্তিরূপে জাতির শিল্প-কলা বিকশিত হয়। সুকুমার কলার বিকাশে জাতির মধ্যে যে শক্তি সূচিত করে, পরে তাই জাতীয় মুক্তির নিমিত্ত কারণ হয়।

আমার জীবন

(শেখভ্)

গোপাল ভৌমিক

(১)

ডিরেক্টর আমাকে বল্লেন : "কেবল মাত্র তোমার পিতার সম্মানের জন্যই তোমাকে রেখেছি—নইলে বহুদিন আগেই তোমার চাকরী যেত।" আমি উত্তর দিলাম : "হুজুর বোধ হয় আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য একথা বল্‌ছেন ; কিন্তু আমার মনে হয় আমার যাবার মত অবস্থা হ'য়েছে।" তারপর তাঁকে আমি বল্‌তে শুন্‌লাম : "এ ছোক্‌রাকে আমার সাম্‌নে থেকে নিয়ে যাও ; ও আমাকে বিরক্ত ক'রে তুলেছে।"

এর দুদিন পরে আমার চাকরী গেল। আমি বড় হ'য়ে বাবার মহা দুঃখের কারণ হ'য়েছিলাম। আমার বাবা মিউনিসিপ্যালিটির ঠিকাদার স্থপতি। আমি ইতিমধ্যেই নয় বার চাকরী বদ্‌লেছি ; আমি এক চাকরী ছেড়ে আরেক চাকরী নিই কিন্তু সব চাকরীই মূলতঃ এক—একই ছাঁচে ঢালা : আমাকে ব'সে ব'সে লিখ্‌তে হয়, কর্তৃপক্ষের নির্বোধ কড়া মন্তব্য শুন্‌তে হয় আর দিন গুণে ব'সে থাক্‌তে হয় কখন আমার চাকরী যায়।

আমি যখন আমার বাবাকে চাকরী যাবার সংবাদ দিলাম তখন তিনি চোখ বুঁজে চেয়ারে হেলান দিয়ে ব'সে ছিলেন। তাঁর ক্ষীণ শুক্‌নো মুখে (তাঁর মুখ বুড়ো ক্যাথলিক অর্গ্যান্‌বাদকের মত ছিল) একটা দীন আত্মসমর্পণের ভাব ছিল। তিনি আমার অভিবাদনের কোন উত্তর না দিয়ে এবং চোখ না খুলেই বল্‌লেন : "আমার প্রিয় পত্নী, তোমার মা, যদি বেঁচে থাক্‌তেন তবে তোমার জীবন তাঁর পক্ষে অনন্ত দুঃখের কারণ হ'ত। আমি তাঁর অসাময়িক মৃত্যুর পিছনে ভগবানের হাত দেখ্‌তে পাই। হতভাগা, তুই নিজেই বল্," তিনি চোখ খুলে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "তোকে নিয়ে আমি কি করি ?"

যখন আমি ছোট ছিলাম তখন আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই জান্‌ত আমাকে নিয়ে কি কর্‌তে হ'বে ; একদল আমাকে স্বেচ্ছাসেবক রূপে সৈন্যদলে যোগ দিতে বল্‌তেন—আরেকদল বল্‌তেন ঔষধের কারখানায় কাজ নিতে আবার কেউবা আমায় টেলিগ্রাফের কাজ শিখ্‌তে বল্‌তেন। কিন্তু এখন যখন আমার বয়েস চব্বিশ বৎসর হ'য়েছে—আমার চুলে পাক ধর্‌তে সুরু ক'রেছে—আমি যখন একে একে সৈন্যদলে, ঔষধের কারখানায় এবং

টেলিগ্রাফে কাজ ক'রে দেখেছি এবং সমস্ত সম্ভাবনাই যখন আমার কাছে নিঃশেষিত প্রায় ব'লে মনে হ'চ্ছে—এখন আর কেউ আমায় উপদেশ দিতে আসেন না: তাঁরা শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলেন আর মাথা নাড়েন।

"তুমি নিজের সম্বন্ধে কি ভাব?" বাবা ব'লে চল্‌লেন, "তোমার বয়সের সব যুবকের সামাজিক পদমর্যাদা আছে আর তোমার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ: তুমি অলস, তুমি ভিক্ষুক, নিজের জীবিকার জন্য বুড়ো বাবার উপর নির্ভরশীল!"

তারপর তিনি তাঁর অভ্যাস মত ব'লে চল্‌লেন যে আধুনিক যুবকরা অবিশ্বাস, জড়বাদ এবং আত্মশ্লাঘার জন্য ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে যাচ্ছে। তাঁর মতে সমস্ত থিয়েটারগুলি বন্ধ ক'রে দেওয়া উচিত কারণ এগুলির প্রভাবেই যুবকরা ধর্ম এবং কর্তব্যের পথ থেকে স'রে যাচ্ছে।

তারপর তিনি বল্‌লেন "আগামী কাল তুমি আমার সঙ্গে যাবে এবং ডিরেক্টরের কাছে ক্ষমা চেয়ে প্রতিজ্ঞা করবে যে ভবিষ্যতে ন্যায়ভাবে কাজ করবে। সামাজিক পদমর্যাদাহীন অবস্থায় একদিনও তোমার থাকা উচিত নয়।" "দয়া ক'রে আমার কথা শুনুন" আমি দৃঢ়ভাবে বল্‌লাম, যদিও ব'লে কিছু লাভ হ'বে ব'লে আমার মনে হ'ল না। "আপনি যাকে সামাজিক পদমর্য্যাদা ব'ল্‌ছেন সে ত মূলধন এবং শিক্ষার সাহায্যে লভ্য। কিন্তু যারা অশিক্ষিত এবং দরিদ্র তারা শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা তাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করে—আমার বিষয়ে যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবে আমি এরূপ কোন কারণ দেখ্‌তে পাই না"।

"তোমার পক্ষে কায়িক পরিশ্রমের কথা বলা মূর্খতা মাত্র," বাবা কিছুটা বিরক্ত হ'য়েই বল্‌লেন, "মূর্খ, বুঝবার চেষ্টা কর—মনে রেখ যে শারীরিক শক্তি ছাড়াও তোমার মধ্যে একটা ঐশী সত্তা আছে—একটি স্বর্গীয় পাবকশিখা যার জন্য তুমি একটি গর্দভ এবং সরীসৃপ থেকে ভিন্ন এবং যার সাহায্যে তুমি ঈশ্বরের নিকটে যেতে পার। হাজার হাজার বৎসরযাবৎ ধ'রে মহপুরা এই পবিত্র অগ্নিশিক্ষা প্রোজ্জল রেখেছেন। তোমার প্রপিতামহ জেনারেল পলোজনিভ্‌ বোরোডিনোতে যুদ্ধ ক'রেছিলেন; তোমার পিতামহ ছিলেন কবি, বাগ্মী এবং শ্রেষ্ঠ সামাজিক পদমর্যাদা সমন্বিত; তোমার কাকা ছিলেন প্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী আর আমি, তোমার বাবা, হ'চ্ছি স্থপতি! তোমার নিভিয়ে দেওয়ার জন্যই কি পলোজনিভ্‌রা এই পবিত্র অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে রেখেছেন?"

"ন্যায়বিচার থাকা উচিত" আমি বল্‌লাম, "লক্ষ লক্ষ লোককে কায়িক পরিশ্রম করতেহয়!"

"তারা করুক্। তারা আর কিছু কর্‌তে পারে না। মূর্খ এবং অপরাধীও কায়িক

পরিশ্রম করতে পারে। এটা দাসত্ব এবং বর্বরতার চিহ্ন কিন্তু পবিত্র অগ্নিশিখালাভ অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে।"

বাবার সংগে তর্ক করা বৃথা। তিনি নিজেকে পূজা করেন বললেও অত্যুক্তি হয় না—নিজের কথা ছাড়া অন্যের কথা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না। তা'ছাড়া আমি ভালভাবেই জানতাম যে যে-বিরক্তির সংগে তিনি কায়িক পরিশ্রম সম্বন্ধে কথা বলছেন, পবিত্র অগ্নি-শিখার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার থেকে সে-বিরক্তির জন্ম নয়; তার জন্ম আমি মজুর হ'বো এবং সহরের লোকেরা আমায় নিয়ে আলোচনা করবে এই গোপন ভয় থেকে। কিন্তু প্রধান কথা এই যে আমার সহপাঠিরা সব বহু আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ ক'রে জীবিকা সংস্থানের চেষ্টা করছিল—ষ্টেট্ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরের ছেলে ত রাজস্ব বিভাগে ভাল চাকরীই করছিল—আর বাবার একমাত্র পুত্র আমিই কিছু করছিলাম না। বাবার সঙ্গে আর আলোচনা করা অর্থহীন এবং অপ্রীতিকর জেনেও আমি সেখানে ব'সেছিলাম এবং বাবা যাতে আমাকে বুঝতে পারেন সেই আশায় মাঝে মাঝে আপত্তি করছিলাম। সমস্যা খুবই সহজ এবং স্পষ্ট: আমি কি ক'রে জীবিকা নির্বাহ করব? কিন্তু বাবার চোখে এই স্পষ্টতা পড়ল না—তিনি মিষ্টি ভাষায় বোরোডিনো, পবিত্র অগ্নিশিখা এবং সেই বিস্মৃত কবি আমার কাকা যিনি বাজে এবং কৃত্রিম ছড়া লিখতেন—সেই সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে চললেন এবং আমাকে মস্তিষ্কহীন মূর্খ বলে গাল দিতে লাগলেন। কিন্তু আমার নিজেকে বোঝানোর জন্য কি প্রবল আগ্রহ! সব সত্বেও আমি বাবাকে এবং আমার বোনকে খুব ভালবাসি; ছোট বেলা থেকে আমি এই ভালবাসাকে এত বেশী বদ্ধমূল ব'লে মনে ক'রে এসেছি যে কখনও বোধ হয় এর হাত থেকে আমি মুক্তি পাব না। আমি ন্যায়ই করি আর অন্যায় করি, আমি তাঁদের মনে আঘাত দিতে সর্বদা ভয় পাই: সব সময় আমার মনে ভয় হয় পাছে রাগে বাবার ক্ষীণ ঘাড় লাল হ'য়ে যায় এবং তিনি মূর্চ্ছা পান।

"আমার মত বয়সের লোকের পক্ষে বদ্ধ ঘরে ব'সে টাইপ্রাইটিং মেসিনের সংগে প্রতি-যোগিতা করা লজ্জাজনক এবং নৈতিক অবনতির কারণ," আমি বললাম। "পবিত্র অগ্নি-শিখার সঙ্গে এর কি যোগাযোগ আছে?"

"তবু এটা বুদ্ধির কাজ," বাবা বললেন। "কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে— এখন এ আলোচনা বন্ধ কর। তোমাকে আমি সাবধান ক'রে দিচ্ছি যে তুমি যদি অফিসে ফিরে যেতে না চাও এবং তোমার ঘৃণ্য মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দাও, তবে তুমি আমার এবং তোমার বোনের ভালবাসা হারাবে। আমি ভগবানের নিকট শপথ করছি উইলে তোমার নামে এক পয়সাও রেখে যাব না।"

অকৃত্রিম সরলতার সংগে আমার মতলবের সাধুতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে আমি বললাম : "উত্তরাধিকারের কথাটা আমার কাছে বড় বলে মনে হয় না। আমার যা' কিছু অধিকার আছে আমি ত্যাগ করছি।"

কোন অপ্রত্যাশিত কারণে আমার কথায় বাবা ভয়ানক চটে গেলেন। তাঁর মুখ লাল হয়ে গেল।

"মূর্খ, তুই আমার সামনে এই কথা বলার সাহস পেলি!" তিনি কর্কশ তীক্ষ্ণ গলায় চীৎকার করে উঠলেন। "বদ্‌মায়েস!" তিনি আমাকে তাড়াতাড়ি নিপুণভাবে আঘাত করলেন; একবার—দু'বার। "তুই নিজেকে ভুলে' গেছিস্।"

ছোট বেলায় বাবা যখন আমাকে মারতেন, আমি সৈনিকের মত খাড়া দাঁড়িয়ে সোজা তাঁর মুখের দিকে তাকাতাম। বাবা ক্ষীণকায় এবং বুড়ো হয়ে গেছিলেন কিন্তু তাঁর মাংসপেশী নিশ্চয়ই চাবুকের মত শক্ত কারণ তিনি খুব জোরে আঘাত ক'রেছিলেন।

আমি বড় ঘরটায় ফিরে গেলাম কিন্তু সেখানে তিনি তাঁর ছাতা দিয়ে কয়েকবার আমার মাথায় এবং কাঁধে মারলেন; ঠিক সেই মুহূর্তে ব্যাপার কি জান্‌বার জন্য আমার বোন বৈঠকখানার দরজা খুলল কিন্তু করুণ ভয়ে তখনই আড়ালে চলে গেল—আমার পক্ষ নিয়ে একটা কথাও বলল না।

আমার অফিসে না ফিরবার সংকল্প—নতুন কর্মজীবন সুরু করবার সংকল্প কিন্তু অচল রইল। এখন শুধু কাজ পছন্দ করা বাকী—সে বিষয়েও বিশেষ অসুবিধা ছিল না—কারণ আমি সবল, ধৈর্যশীল এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। যে জীবন একঘেয়ে কর্মমুখর, যে জীবন অর্ধাহার, নোংরা রুক্ষ পারিপার্শ্বিকে পূর্ণ, যে জীবনে সর্বদা কাজ এবং জীবিকানির্বাহের স্থূল চিন্তা—এমন জীবনের সঙ্গে মুখোমুখী দাঁড়াতে আমার কোনই আপত্তি ছিল না। আর কে জানে হয়ত কাজ থেকে গ্রেট জেন্ট্রি ষ্ট্রিটে ফিরে এসে আমি এঞ্জিনিয়ার ডলঝিক্‌ভকে—যিনি বুদ্ধির কাজ করেন—ঈর্ষা করতাম কিন্তু এখন আমার ভাবী জীবনের বিপদের কথা ভাবতে খুব আরাম লাগল। আমি আগে বুদ্ধিজীবী কাজের কথা ভাবতাম—মনে মনে নিজেকে শিক্ষক, ডাক্তার কিংবা লেখক বলে ভাবতাম কিন্তু আমার সে সব স্বপ্নই র'য়ে গেল। বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা ক'রে আমি আনন্দ পেতাম—থিয়েটার এবং পড়াশুনা করা আমার মজ্জাগত অভ্যাস হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু কোন বুদ্ধির কাজ করবার মত সামর্থ্য আমার ছিল কিনা আমি জান্‌তাম না। স্কুলে গ্রীক্ ভাষার প্রতি আমার একটা অপরাজেয় বিদ্বেষ ছিল কাজেই চতুর্থ শ্রেণীতেই আমাকে পাঠ সমাপ্ত করতে হ'য়েছিল। আমাকে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য তৈরী কতে মাষ্টার রাখা হ'য়েছিল—তারপর আমি অনেক

চাকরী করলাম,— অফিসে বেশীর ভাগ সময়ই পরিপূর্ণ আলস্যে কাটতে হ'ত,—তবু আমি শুনতাম যে এরই নাম নাকি 'বুদ্ধির কাজ'!

শিক্ষা বিভাগে কিংবা মিউনিসিপ্যাল্ অফিসে আমার যে কাজ তাতে মানসিক প্রয়াস, প্রতিভা, ব্যক্তিগত সামর্থ্য কিংবা আধ্যাত্মিক সৃজনী ক্ষমতা কিছুরই দরকার ছিল না; এ কাজ ছিল সম্পূর্ণরূপে যান্ত্রিক এবং এই রকম 'বুদ্ধির কাজ' আমার মতে শারীরিক পরিশ্রমের চেয়েও নীচুদরের। আমি এরকম কাজ ঘৃণা করি এবং এক মুহূর্তের জন্যও এরূপ অলস নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের কোন সার্থকতা দেখি না, কারণ এরূপ জীবন যাপন করা কুঁড়েমি এবং জুয়োচুরির নামান্তর মাত্র। খুব সম্ভব সত্যিকারের 'বুদ্ধির কাজে'র সংগে আমার সাক্ষাতই হয়নি।

সন্ধ্যার সময়। সহরের প্রধান রাস্তা গ্রেট্ জেন্ট্রি ষ্ট্রীটে আমরা বাস করতাম—সাধারণের জন্য কোন পার্ক্ না থাকায় আমাদের ধনী সামাজিক পদমর্যাদাশীল লোকেরা সন্ধ্যাবেলা রাস্তায়ই বেড়াতেন। রাস্তাটা খুবই সুন্দর—অনেকটা বাগানের মতই কারণ এর দুই পার্শ্বের সারিবদ্ধ পপ্লার গাছ। পপ্লারের গন্ধ কি মিষ্টি—বিশেষতঃ বৃষ্টির পরে। অ্যাকাশিয়া, আপেল গাছ এবং অন্যান্য লম্বা গাছ বেড়ার উপরে ঝুলে থাকত। মে মাসের সন্ধ্যাবেলা—লিলাকের সুগন্ধ, পাখীর কূজন—উষ্ণ স্তব্ধ বাতাস—কেমন নতুন আর অসাধারণ সব! যদিও প্রতি বৎসরই বসন্ত আসে তবুও যেন কেমন সব নতুন নতুন ঠেকে। আমি সদর দরজায় দাঁড়িয়ে পথচারীদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এঁদের বেশীর ভাগের সংগেই আমি হেসে খেলে বড় হয়েছি কিন্তু হয়ত এঁদের মধ্যে আমার উপস্থিতি বিরক্তিজনক হবে কারণ আমার পরিধানে সাধারণ দীন পোষাক এবং লোকে আমার সংকীর্ণ পাজামা এবং বড় কদাকার বুট দেখে ঠাট্টা করে। তা ছাড়াও সহরে আমার কুখ্যাতি ছিল যে আমার সামাজিক পদমর্যাদা নেই—আমি নিম্নস্তরের কাফেতে বিলিয়ার্ড খেলি এবং একবার প্রায় বিনা কারণেই রাজনৈতিক পুলিশ কর্তৃক ধৃত হ'য়েছিলাম।

রাস্তার উপরে এঞ্জিনিয়ার ডল্‌ঝিকভের বড় বাড়ীটায় কে যেন পিয়ানো বাজাচ্ছিল। বর্ধিষ্ণু গাঢ় অন্ধকারে তারাগুলো জ্বল্ জ্বল্ করছিল। ধীরে লোকের অভিবাদন ফিরিয়ে দিতে দিতে আমার বাবা আমার বোনের হাত ধরে বেড়াচ্ছিলেন। বাবার মাথায় পুরানো চওড়া কোঁকড়ানো কিনারওয়ালা একটি টুপি।

"দেখ!" তিনি যে ছাতাটি দিয়ে এখনই আমায় মেরেছেন সেই ছাতাটি দিয়ে আকাশের দিকে দেখিয়ে আমার বোনকে বললেন: "আকাশের দিকে দেখ! ক্ষুদ্রতম নক্ষত্রগুলিও এক একটি পৃথিবী! বিশ্বের সঙ্গে তুলনায় মানুষ কত ক্ষুদ্র!"

তিনি কথাগুলো এমন গলায় বললেন যে শুনে' মনে হ'ল যে এই ছোট হওয়াতে তিনি বোধ হয় গর্ব এবং আনন্দ অনুভব করছেন। বাবা কি প্রতিভাহীন লোক! দুঃখের বিষয় বাবাই সহরের এক মাত্র স্থপতি এবং গত পনর বিশ বছরের মধ্যে সহরে একখানাও সুন্দর বাড়ী নির্মিত হ'য়েছে ব'লে আমার মনে পড়ল না। যখনই তিনি কোন বাড়ীর পরিকল্পনা করেন তখনই তিনি কাজ সুরু করেন প্রথম হল্ ঘর এবং বৈঠকখানা থেকে; আগেকার দিনে মেয়েরা যেমন কেবল মাত্র উনুনের পার থেকেই নাচ্‌তে সুরু করতে পারত, তাঁরও তেমনি শিল্পকল্পনার বিবর্তন সুরু হ'ত হল্ এবং বৈঠকখানা থেকে। এর পরে তিনি যোগ করতেন খাবার ঘর, ছেলে মেয়েদের ঘর, পড়ার ঘর—আর এই ঘরগুলিকে সংযুক্ত করতেন দরজা দিয়ে। ফলে, ঘরগুলি প্রায় পথের সামিল হ'য়ে পড়্‌ত—এক একটা ঘরে দুটো তিনটি ক'রে দরজা থাক্‌ত। তাঁর তৈরী বাড়ীগুলি অস্পষ্ট, বিশৃংখল এবং সংকীর্ণ হ'ত। প্রত্যেক বারই তাঁর মনে হ'ত কিছু যেন বাদ গেছে—তখন তিনি আস্তরণ দিয়ে একটার পর একটা যোগ দিতে থাক্‌তেন, ফলে বহু সাধারণ প্রবেশ পথ এবং বাঁকা সিঁড়ির জন্ম হ'ত। এই সব বাঁকা সিঁড়ির কোণে কোন রকমে মাথা গুঁজে দাঁড়ানো যেত এবং এখানে মেঝের পরিবর্তে রুশীয় বাথের মত পাতলা সিঁড়ির ধাপ থাক্‌ত। আর তাঁর তৈরী রান্নাঘর সব সময়ই খিলান দেওয়া, ইঁটের মেঝেওয়ালা এবং বাড়ীর নিচে হ'ত। তাঁর নির্মিত বাড়ীর সম্মুখ ভাগে সব সময়ই একটা কঠিন ভীরু রেখাংকিত একগুঁয়ে ভাব থাকত,—নীচু বসা ছাদ আর মোটা কাল আবরণী দেওয়া পুডিংয়ের মত চিম্‌নি—তার মাথায় শব্দায়মান বায়ু-নির্দেশক। বাবার তৈরী সব বাড়ীগুলিই আমার কাছে এক রকম মনে হ'ত এবং অস্পষ্টভাবে আমাকে তাঁর টুপির কথা এবং তাঁর দৃঢ় একগুঁয়ে মস্তকের পশ্চাদ্‌ভাগের কথা স্মরণ করিয়ে দিত। কালক্রমে সহরের লোকেরা বাবার প্রতিভাহীনতায় অভ্যস্ত হ'য়ে উঠল এবং তাঁর স্থাপত্য শিল্প শিকড় গেড়ে নামার্জন করল "আমাদের স্টাইল্"।

আমার বাবা আমার বোনের জীবনে এই স্টাইলের গোড়াপত্তন করলেন। তিনি তার নামকরণ করলেন ক্লিওপেট্রা (তিনি আমার নাম রেখেছিলেন মিসেল্)। যখন সে ছোট ছিল তখন তিনি তাকে তারা এবং আমাদের পুর্বপুরুষদের কথা বলে ভয় দেখাতেন; এখন ক্লিওপেট্রার ছাব্বিশ বছর বয়সেও তিনি তার সঙ্গে আগের মতই ব্যবহার করেন—তাকে নিজের হাত ছাড়া অন্য কারও হাত ধরতে দেন না এবং মনে মনে ভাবেন যে দুদিন আগে হোক্ আর পরে হোক্ কোন যুবক একদিন এসে তাঁর গুণাবলীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে চাইবে। আমার বোন বাবাকে পূজা করত বললেও অত্যুক্তি হয় না—তাঁকে ভয় করত—তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিশক্তিতে বিশ্বাস করত।

খুব অন্ধকার হয়ে এল—পথও ধীরে ধীরে খালি হয়ে গেল। সম্মুখের বাড়ীর সংগীত থেমে গেল। দরজা উন্মুক্ত ছিল—বাইরে রাস্তায় ঘণ্টা বাজিয়ে একটা গাড়ী এল—এঞ্জিনিয়ার এবং তাঁর মেয়ে বেড়াতে যাবেন। শোবার সময় হয়ে এল।

বাড়ীর মধ্যে আমার একটা ঘর ছিল—কিন্তু আমি উঠানে একটা কুটিরে ঘুমাতাম,—এই কুটিরটি আস্তাবলের ছাদের নীচেই। বোধ হয় এই ঘরটি ঘোড়ার সাজের জন্যই তৈরী হয়েছিল কারণ দেয়ালে বড় বড় পেরেক্ পোতা আছে। কিন্তু এখন আর ওটা ব্যবহৃত হয় না—বাবা ত্রিশ বছর ধরে' খবরের কাগজ জমিয়েছেন এই ঘরে। যে কোন কারণে হোক্ তিনি ছয় মাসের কাগজ একত্র করে বেঁধে রাখেন—কাউকে সে কাগজ ছুঁতে দেন না। এখানে বাস করাতে বাবা এবং তার অতিথিদের সংস্পর্শে আমি খুব কমই আস্তাম। মনে মনে ভাবতাম যে ভাল ঘরে যদি বাস না করি এবং খাবার জন্য রোজ যদি বাড়ী না যাই তবে আমি বাবার উপরে থাচ্ছি তাঁর এই অভিযোগটা আমার গায় কিছু কম লাগ্‌বে।

বোন আমার জন্য অপেক্ষা ক'রে ছিল। সে বাবাকে না জানিয়ে আমার জন্য নৈশ-ভোজ নিয়ে এসেছিল—এক টুক্‌রো ঠাণ্ডা ভীল আর এক টুকরো রুটি। আমাদের পরিবারে অনেক প্রবাদ বাক্য প্রচলিত ছিল যেমন 'অর্থ হিসাব ভালবাসে' অথবা 'এক কোপেক এক রুবল বাঁচায়'; এই সব জ্ঞানের কথায় মুগ্ধ হয়ে আমার বোন ব্যয় বাহুল্য কমানোর চেষ্টা করত এবং আমাদের কম করে খেতে দিত। সে টেবিলের ওপর খাবারটা রেখে আমার বিছানায় বসে কাঁদতে লাগল।

"মিসেল্," সে বলল, "তুমি আমাদের সংগে কেমন ব্যবহার করছ?" সে তার মুখ ঢাকে নি—তার চোখের জল গাল এবং হাত বেয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল—তাঁর মুখের ভাব খুব বিষণ্ণ। সে বালিশের উপর পড়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে কাঁদ্‌তে লাগল।

"তুমি আবার তোমার কাজ ছেড়েছ!" সে বলল। "কি ভয়ানক!" "বোন, বুঝ্‌বার চেস্টা কর," আমি তাকে বললাম। ওর কান্না দেখে আমি হতাশ হ'য়ে গেছিলাম।

যেন ইচ্ছাকৃত ব্যবস্থানুসারেই আমার ছোট ল্যাম্পটার পলতে শেষ হয়ে গেল--ল্যাম্প প্রচুর ধূম্র উদ্গীরণ সুরু করল। দেয়ালের গায়ে পুরানো পেরেক্‌গুলো আর কম্পমান ছায়াগুলো কি ভয়ংকর দেখতে!

"আমাদের বাঁচাও!" বোন উঠে দাঁড়িয়ে বলল। "বাবার ভয়ানক অবস্থা—আর আমিও অসুস্থ। আমি পাগল হয়ে যাব। তোমার কি হ'বে?" সে কাঁদতে কাঁদতে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করল। "আমি তোমায় অনুরোধ

করছি—মায়ের নামে তোমার কাছে আমার এই অনুরোধ তুমি আবার কাজে ফিরে যাও।"

"আমি তা' পারি না, ক্লিওপেট্রা" আমি বললাম—মনে মনে অনুভব করছিলাম যে আরেকটু জোর করলেই আমায় হার মানতে হ'বে। "আমি পারি না।"

"কেন?" আমার বোন চাপ দেয়। "কেন? তোমার উপরওয়ালার সংগে না মেলে, অন্য কাজ দেখ। তুমি রেলওয়েতেই কেন কাজ নাও না? আমি এইমাত্র অ্যানিউটা ব্লাগোভোর সংগে কথা ব'লেছি—সে আমাকে আশা দিয়েছে যে তোমার চাকরী হবে,—সে তোমার জন্য যতটা পারে করবে বলে ভরসা দিয়েছে। মিসেল, ভেবে দেখ—আমার অনুরোধ ভেবে দেখ।"

আর কিছুক্ষণ তর্ক করার পর আমি আত্মসমর্পন করলাম। আমি বললাম যে রেলওয়েতে কাজ করার কথা আমার মাথায় আসেই নি'—আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করে দেখব।

সে চোখের জলের মধ্যেই সুখের হাসি হাসল—আনন্দে আমার হাত চেপে ধরল—ওর কান্না কিন্তু থামছিল না। আমি রান্নাঘরে পলতে আনতে গেলাম।

(২)

সখের থিয়েটার, সাহায্য রজনী, ট্যাবলো প্রভৃতির সমর্থকদের নেতা ছিলেন অ্যাজো-গুইন্ পরিবার। গ্রেট্ জেন্ট্রি ষ্ট্রিটে তাঁদের নিজেদের বাড়ী ছিল। তাঁরা এই উদ্দেশ্যে নিজেদের বাড়ীতে ঘর দিতেন, আবশ্যকীয় ঝঞ্ঝাট পোয়াতেন এবং খরচ বহন করতেন। তাঁরা ধনী জমিদার ছিলেন—তাঁদের প্রায় তিন হাজার ডেসিয়াটিন্ (dessiatin) জমি ছিল—নিকটেই তাঁদের চমৎকার গোলাবাড়ী ছিল কিন্তু তাঁরা গ্রাম্যজীবন ভালবাসতেন না বলে শীত গ্রীষ্ম সব সময়েই সহরে থাক্‌তেন। পরিবারে, মা এবং তিনটি মেয়ে ছিলেন; মা ছিলেন লম্বা রোগাটে ধরণের—তাঁর মাথায় ছিল ছোট করে কাটা চুল—তিনি ব্লাউস্ আর সাধারণ স্কার্ট্ পরতেন। মেয়ে তিনটিকে নাম ধরে ডাকা হত না—তাদের উল্লেখ করা হত বড়, মেজো এবং ছোট মেয়ে বলে; তাদের সকলেরই কুৎসিত তীক্ষ্ণ চিবুক ছিল দৃষ্টিশক্তি কম আর কাঁধ ছিল উঁচু; তারা মায়ের মত পোষাক পরত আর তাদের কথা বলবার ধরণ ছিল অপ্রীতিকর—তবু তারা থিয়েটারে অভিনয় করত এবং সব সময় অভিনয় আবৃত্তি এবং গান করে সাহায্য রজনীর অনুষ্ঠান করত। তারা সবাই গম্ভীর থাক্‌ত—হাস্‌ত না মোটেই এবং এমন কি নেহাৎ ভাঁড়ামীর বইয়েও তারা গম্ভীর ব্যবসায়ী সুলভ ভাবে অভিনয় করত যেন তারা হিসাব রাখার কাজে নিযুক্ত।

আমি এই সব অভিনয় খুব ভালবাসতাম—বিশেষ করে মহড়াগুলো। প্রায়ই মহড়া হত এবং তাতে গণ্ডগোল ছাড়া বিশেষ কিছু হত না—পরে আমাদের নৈশভোজে তৃপ্ত করা

হত। বই বাছাই কিংবা চরিত্র বণ্টনে আমার কোন হাত থাকত না। আমি ছিলাম মঞ্চ-ব্যবস্থাপক। আমি দৃশ্য-পরিকল্পনা করতাম—অভিনয়াংশ নকল করে দিতাম—নেপথ্য থেকে পার্ট বলে দিতাম আর সাজসজ্জা করে দিতাম। তাছাড়া অন্যদিকে আমাকে নজর রাখ্‌তে হত—যেমন যথাসময়ে বজ্রের শব্দ করা কিংবা বুলবুলির ডাকের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি। সামাজিক পদমর্যাদা না থাকায় আমার ভাল পোষাক ছিল না—তাই এই সব মহড়ার সময় আমাকে সকলের কাছ থেকে দূরে দূরেই থাক্‌তে হত—আমি অন্ধকার মঞ্চের আড়ালে নিঃশব্দে লজ্জিতভাবে থাক্‌তাম।

আমি অ্যাঝোগুইনদের আস্তাবলে কিংবা উঠানে ব'সে ব'সে দৃশ্যাংকন করতাম। আমাকে একাজে একজন গৃহ-চিত্রকর সাহায্য করত—লোকটি নিজেকে ঠিকাদার রূপকার বলে জাহির করত। তার নাম অ্যাণ্ড্রে আইভানোভ্‌—বয়স তার পঞ্চাশের কাছাকাছি—লম্বা, পাতলা, এবং বিবর্ণ দেখতে; বুকের ছাতি সংকীর্ণ—চোখের নীচে কালো দাগ: এক কথায় লোকটা দেখতে ভয়ানক। তার একরকম ক্ষয়রোগ ছিল—প্রত্যেক বছর বসন্ত এবং হেমন্ত কালে তার নাকি মরবার মত অবস্থা হত; কিন্তু সে কিছুক্ষণের জন্য বিছানায় যেয়ে শু'ত তারপর উঠে ব'সে সবিস্ময়ে বলত: "এবার আমি ম'রলাম না!"

সহরে সবাই তাকে র‍্যাডিশ্‌ বলত—লোকের মুখে শুনতাম এইটাই নাকি তার প্রকৃত নাম। সেও আমার মত থিয়েটার ভালবাসত। থিয়েটার হ'বে শুন্‌লেই সে সমস্ত কাজ ফেলে অ্যাঝোগুইনদের বাড়ী যেত দৃশ্যাংকন করতে।

আমার বোনের সংগে আলোচনার পরদিন ভোর থেকে রাত অবধি আমি অ্যাঝো-গুইনদের বাড়ীতে কাজ করলাম। সন্ধ্যা ৭টায় মহড়া হবার কথা ছিল তার এক ঘণ্টা পূর্বেই সব অভিনেতা এসে জমেছিল এবং বড়, মেঝো এবং ছোট কুমারী অ্যাঝোগুইন মঞ্চের উপর নিজের নিজের অভিনয়াংশ পাঠ করছিল। লম্বা বাদামী রঙের ওভারকোট পরে, গলায় স্কার্ফ জড়িয়ে দেয়ালে ঠেস্‌ দিয়ে মুগ্ধভাবে র‍্যাডিশ্‌ মঞ্চের দিকে তাকিয়ে ছিল। মিসেস্‌ অ্যাঝোগুইন প্রত্যেক অতিথির কাছে গিয়ে প্রত্যেককেই তাঁর মধুর সম্ভাষণ জানাচ্ছিলেন। লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় তাঁর কথা বলার এমন একটা ধরণ ছিল যেন তিনি কোন গোপনীয় কথা বলছেন।

"দৃশ্যাংকন নিশ্চয়ই খুব কঠিন," তিনি মৃদুস্বরে আমার কাছে এসে বললেন। "আমি এই মিসেস্‌ মাফ্‌কের সংগে কুসংস্কার সম্বন্ধে কথা বলছিলাম—তখনই তোমাকে ভিতরে আস্‌তে দেখ্‌লাম। হায় ভগবান্‌! আমি সারাজীবন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি।

তাদের কুসংস্কারটা যে ভিত্তিহীন এই কথাটা চাকর বাকরকে বোঝানোর জন্য আমি সর্বদাই তিনটে মোমবাতি জ্বালি এবং আমার সব দরকারী কাজই তের তারিখে আরম্ভ করি !"

এঞ্জিনিয়ার ডলঝিকভের মেয়েও এসেছিল—সুন্দর স্বাস্থ্যবতী মেয়ে—তার পরণে আমাদের সহরের লোকেরা যাকে বলে প্যারীর স্টাইল,—সেই ধরণের পোষাক। সে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করত না কিন্তু মহড়ার সময় তার জন্য মঞ্চের উপর একটা চেয়ার থাকত আর অভিনয়ের দিন প্রথম শ্রেণীতে সে তার চমক্-লাগানো পোষাক প'রে এসে না বস্‌লে অভিনয় আরম্ভই হ'ত না। রাজধানী থেকে এসেছে বলে মহড়ার সময় তাকে তার মন্তব্য প্রকাশ করতে দেওয়া হ'ত এবং সেও দয়া করে মিষ্টি হাসি হেসে তার মন্তব্য প্রকাশ কর্‌ত। স্পষ্ট বোঝা যেত যে সে আমাদের অভিনয়কে ছেলেমানুষি বলে মনে কর্‌ত। লোকে বলত যে সে-নাকি পিটার্সবার্গে সংগীত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিল এবং একবার শীতকালে অপেরায় গানও গেয়েছিল। আমার ওকে খুব ভাল লাগ্‌ত এবং মহড়া ও অভিনয়ের সময় আমি এক মুহূর্তের জন্যও ওর উপর থেকে আমার চোখ সরিয়ে নিতাম না।

আমি অভিনয়ে সাহায্য করার জন্য কেবল মাত্র বইটা হাতে তুলে নিয়েছি এমন সময় আমার বোন এসে উপস্থিত। কোট এবং টুপি না খুলেই সে আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল : "দয়া ক'রে এস।"

আমি গেলাম। মঞ্চের পিছনে দরজায় অ্যানিউটা ব্লাগোভো টুপি এবং কালো অবগুণ্ঠন প'রে দাঁড়িয়েছিল। সে কোর্টের সহকারী সভাপতির কন্যা; বহু বছর আগে যখন প্রথম এ সহরে হাইকোর্ট হয় তখন থেকেই তার বাবা এই কাজে নিযুক্ত আছেন। সে দেখ্‌তে লম্বা এবং তার চেহারা বেশ সুন্দর ছিল। সে না হ'লে ট্যাবলো চলত না—যখন সে পরী কিংবা কোন দেবীর সাজ নিত তখন লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে যেত; কিন্তু অভিনয়ে কোন অংশ সে নিত না—কেবল মাঝে মাঝে মহড়ার সময় কাজের খাতিরে এসে ঘরে উঁকি দিত—তবু ঘরে ঢুকত না। এখনও সে মুহূর্তের জন্যই এসেছিল।

"আমার বাবা আপনার কথা ব'লেছেন" সে আমার দিকে না তাকিয়ে সলজ্জ শুষ্ক স্বরে বল্‌লে "ডলঝিকভ্ রেলওয়েতে আপনাকে একটা কাজ দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কাল যদি তাঁর বাড়ী যান তবে তিনি আপনার সংগে দেখা করবেন।"

আমি অবনত হয়ে তাকে তার দয়ার জন্য ধন্যবাদ জানালাম।

"এবং আপনার এটা ছাড়্‌তে হবে," সে আমার হাতের নাটকখানা দেখিয়ে বল্‌ল। সে এবং আমার বোন মিসেস্ অ্যাঝোগুইনের কাছে গিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে চুপি চুপি কথা বলতে লাগল।

"সত্যি !" মিসেস্ অ্যাঝোগুইন্ আমার কাছে এসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন। "সত্যি এতে যদি তোমার কাজের ক্ষতি হয় ত' তিনি আমার হাত থেকে বইটা নিলেন, "তবে এটা অন্য কাউকে দাও। বন্ধু, ভেবো না—সব ঠিক হয়ে যাবে !"

আমরা বিদায় অভ্যর্থনা জানিয়ে বিব্রতভাবে চলে এলাম। নীচে এসে আমার বোন এবং অ্যানিউটা ব্লাগোভোকে চ'লে যেতে দেখলাম। তারা খুব উৎসাহের সংগে আলোচনা করছিল বোধ হয় আমারই রেলে চাকরী নেওয়া সম্বন্ধে। তারা তাড়াতাড়ি চ'লে গেল। আমার বোন ইতিপূর্বে কোনদিন মহড়ায় আসে নি এবং সে হয়ত বিবেক-যন্ত্রণা ভোগ করছিল—তা'ছাড়া বাবার ভয়ও ছিল, কি জানি তিনি যদি জানতে পারেন যে ও বিনানুমতিতে মহড়ায় গেছিল।

পরদিন একটার সময় আমি ডল্‌ঝিকভের সংগে দেখা করতে গেলাম। চাকরটা আমাকে একটি সুন্দর ঘরে নিয়ে গেল—সেটা এঞ্জিনিয়ারের বৈঠকখানা ও পড়ার ঘর। ঘরটার প্রত্যেকটি জিনিষ সুন্দর এবং সুরুচির পরিচায়ক—আমার মত অনভ্যস্ত লোকের কাছে সবই অদ্ভুত ঠেক্‌তে লাগল। দামী কার্পেট, বড় বড় চেয়ার, ব্রঞ্জ, সোনালী, ভেলভেটের ফ্রেমে ছবি, দেয়ালে অনেক সুন্দরী রমণীর ছবি, বুদ্ধিদীপ্ত সুন্দর মুখ, বিস্ময়জনক অঙ্গভঙ্গী; বৈঠকখানা থেকে বারান্দা দিয়ে একটি রাস্তা সোজা বাগানে চলে গেছে। আমি লিলাক, প্রাতরাশের জন্য সংস্থাপিত একটা টেবিল এবং গোলাপ-গুচ্ছ দেখতে পেলাম; বসন্তের সুগন্ধ, ভাল সিগারের গন্ধ—সব মিলে একটা সুখের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল সব কিছু আমাকে যেন বলতে লাগল যে এখানে যে লোকটি বাস করে সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখের অধিকারী। টেবিলে এঞ্জিনিয়ারের মেয়ে ব'সে একটা খবরের কাগজ পড়ছিল।

"আপনি কি বাবাকে চান ?" মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল। "তিনি স্নান করছেন—এখনই আসবেন। আপনি দয়া ক'রে বসুন।"

আমি বসলাম।

"আমার মনে হয় আপনি রাস্তার ওপারের বাড়ীটায় থাকেন।" সে কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন করল।

"হাঁ"

"আমার যখন কোন কাজ থাকে না, আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকি। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন" সে খবরের কাগজের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বল্‌ল, "আমি প্রায়ই আপনাকে এবং আপনার বোনকে দেখি। আপনার বোনের মুখে সুন্দর একটা সদয় সতৃষ্ণ ভাব আছে।"

ডল্‌ঝিকভ্‌ ভিতরে এলেন। তিনি তোয়ালে দিয়ে ঘাড় মুছ্‌ছিলেন। "বাবা ইনি মিঃ পলোজ্‌নিভ্‌" তাঁর মেয়ে বল্‌ল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। ব্রাগোভো ওর বিষয় ব'লেছিলেন।" তিনি আমার দিকে ফির্‌লেন বটে কিন্তু হাত এগিয়ে দিলেন না। "কিন্তু তোমাকে আমি কি দিতে পারি মনে কর? আমার হাতে ত আর কাজের ছড়াছড়ি নয়। তোমরা সবাই অদ্ভুত।" তিনি জোর গলায় ব'লে চল্‌লেন যেন তিনি আমায় তিরস্কার কর্‌ছেন। "জন কুড়ি লোক রোজই আমার কাছে আসে যেন আমি ষ্টেটের কোন বিভাগের কর্তা আর কি? আমি একটা রেল্‌ওয়ে চালাই এইত! আমি কুলী মজুর খাটাই—কুলী, মিস্ত্রী, কূপখননকারী এইসব আমার দরকার আর তোমরা শুধু ব'সে ব'সে লিখতেই জানো। এইত বিদ্যা! তোমরা সব কেরাণীর দল!"

তাঁর কার্পেট এবং চেয়ারের মত তাঁর সারা দেহেও একটা সুখের ভাব। তিনি হৃষ্টপুষ্ট, স্বাস্থ্যবান্‌—তাঁর গাল লাল আর বুক চওড়া। পাটল বর্ণের সার্ট আর ঢোলা প্রাজামায় তাকে বেশ ফিট্‌ফাট দেখাচ্ছিল যেন চীনামাটির তৈরী একটি পত্রবাহক। তাঁর গোলাকৃতি খাড়া খাড়া দাড়ি ছিল মাথায় একটিও পাকা চুল ছিল না; নাকের উপর সামান্য একটু সেতু আর চোখ দুটি উজ্জ্বল, সরল এবং কালো।

"তুমি কি করতে পার?" তিনি ব'লে চল্‌লেন। "কিছুই না। আমি একজন অবস্থাপন্ন এঞ্জিনিয়ার কিন্তু এই রেলওয়ে তৈরীর ভার পাবার আগে আমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হ'ত। আমি দু'বছরের জন্য এঞ্জিন্‌-চালক ছিলাম—আমি বেল্‌জিয়ামে সাধারণ লুব্রিকেটরের কাজ ক'রেছি। এখন তুমি একটু ভেবে দেখত তোমায় আমি কি কাজ দিতে পারি?"

"আমি আপনার সব কথাই মেনে নিচ্ছি" আমি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বল্‌লাম। তাঁর উজ্জ্বল সরল চোখের দিকে চাইবার সাহস আমার ছিল না।

"তুমি টেলিগ্রাফের কিছু জানো?" তিনি কিছুক্ষণ চিন্তার পর বল্‌লেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি টেলিগ্রাফের কাজ ক'রেছিলাম।"

"হুঁ—আচ্ছা দেখা যাক্‌। তুমি ডুবেক্‌নিয়ায় যাও। ওখানে একটি ছোক্‌রা আছে বটে কিন্তু সে বেটা ভবঘুরে।"

"আমায় কি কর্‌তে হবে?" প্রশ্ন কর্‌লাম।

"সে পরে দেখা যাবে। এখন সেইখানে যাও। আমি পরে তোমায় জানাব। কিন্তু দেখ মদ খেয়ে মাতলামি ক'রো না কিংবা দরখাস্ত পাঠিয়ে আমায় উত্যক্ত ক'রো না। তাহ'লে কিন্তু দূর করে তাড়িয়ে দেব বুঝলে?"

তিনি কোনরূপ সৌজন্য না দেখিয়েই আমার দিকে পিছন ফির্লেন। আমি অবনত হ'য়ে তাঁকে এবং খবরের কাগজ পাঠনিরতা তাঁর মেয়েকে নমস্কার ক'রে বেরিয়ে এলাম। আমার এমন বিশ্রী লাগছিলো যে বোন যখন জানতে চাইল এঞ্জিনিয়ার আমায় কিরূপ অভ্যর্থনা কর্লেন, আমি তখন একটা কথাও বল্‌তে পার্‌লাম না।

ডুবেক্‌নিয়ায় যাওয়ার জন্য আমি ভোরবেলা সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই উঠলাম। রাস্তার জনপ্রাণী ছিল না—সমস্ত সহর ঘুমিয়েছিল—রাস্তায় শুধু আমার পায়ের ফাঁপা শব্দ। শিশিরসিক্ত পপলার গাছের মৃদু সুগন্ধে বাতাস পরিপূর্ণ। আমার বিষণ্ণ মন সহর ছেড়ে যেতে চাইছিল না। কি সুন্দর উষ্ণ এই সহরটী। সবুজ গাছগুলি, শান্ত সূর্যোজ্বল প্রাতঃকালগুলি, ঘণ্টার ধ্বনি সব আমি ভালবাসতাম- শুধু সহরের মানুষগুলো ছিল আমার কাছে বিদেশীর মত—বিরক্তিকর, এমন কি সময় সময় ঘৃণ্যও বটে। আমি তাদের পছন্দও করতাম না—বুঝ্‌তামও না।

আমি বুঝ্‌তে পারতাম না কেন কি উদ্দেশ্যে এই পঁয়ত্রিশ হাজার লোক জীবন ধারণ করত। আমি জান্‌তাম কিম্‌রির লোকেরা বুট্ তৈরী ক'রে জীবন ধারণ করে, টুলায় স্যামোভার (রুশীয় চায়ের পাত্র) এবং বন্দুক তৈরী হয় আর ওডেসা একটী বন্দর; কিন্তু আমি জান্‌তাম না আমাদের সহরটা কি বা এর দ্বারা কি কাজ হয়। গ্রেট জেন্ট্রি ষ্ট্রিট এবং অন্য দুইটী পরিষ্কার রাস্তার লোকেরা স্বাধীন ভাবে এবং সরকারী তহবিলের টাকায় জীবিকা-নির্বাহ কর্‌ত কিন্তু আরও যে আটটি রাস্তা ছিল যেগুলো পরস্পর সমান্তরালভাবে প্রায় তিন মাইল্ অবধি গিয়ে পাহাড়ের পিছনে মিলিয়ে গেছে—সেখানকার লোকেরা কেমনভাবে জীবিকানির্বাহ কর্‌ত—সেটা সব সময়ই আমার কাছে একটা বিরাট সমস্যা ছিল। তারা যে ভাবে বাস করত সে কথা ভাবতেও আমার লজ্জা হয়। সাধারণ পার্ক, থিয়েটার কিংবা ভাল একটা অর্কেষ্ট্রা ছিল না; সহরের এবং ক্লাবের লাইব্রেরীগুলো ব্যবহার কর্‌ত কেবলমাত্র তরুণ ইহুদীরা, কাজেই বই এবং পত্রিকা মাসের পর মাস অস্পৃষ্টই থাক্‌ত। ধনী এবং বিদ্বান ব'লে পরিচিত লোকেরা ছারপোকা-ঘেরা কাঠের বিছানায় বদ্ধ ঠাসা ঘরে ঘুমোত; শিশুদের রাখা হ'ত নার্সারি নামক ময়লা ধূলিজীর্ণ-ঘরে এবং বুড়ো আর মাননীয় হলেও চাকরেরা খাবার ঘরের মেঝেয় ছেঁড়া কাপড়ে গা' ঢেকে ঘুমোত। দুর্গন্ধময় খাদ্য আর অস্বাস্থ্যকর জল। বহু বছর ধ'রে সহরের কাউন্সিলে, শাসনকর্তার বাড়ীতে প্রধান ধর্মযাজকের বাড়ীতে আলোচনা চল্‌ছে যে সহরে ভাল সুদ্ধ জল সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকায় সরকারী তহবিল থেকে দুল'ক্ষ রুব্‌ল্ ঋণ নিতে হ'বে। এমন কি সহরের খুব বড় ধনী লোকেরা—এরকম জন ত্রিশেক ধনী সহরে ছিল- যারা তাসখেলায় এক একটা সম্পত্তি

উড়িয়ে দিতেও কসুর করে না তারাও খারাপ জল খেত আর সোৎসাহে ঋণের আলোচনা করত—আমি এটা কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌তাম না; ওরাত অতি সহজেই দু'লক্ষ রুবল্‌ দিতে পারে।

সহরে একজনও সাধুলোক আছে ব'লে আমি জানতাম না। আমার বাবা ঘুষ নিতেন আর মনে কর্‌তেন যে লোকে বুঝি তাঁর আধ্যাত্মিক গুণের সম্মানার্থ তাঁকে টাকা দেয়। হাইস্কুলের ছাত্ররা ওপরের শ্রেণীতে ওঠার জন্য শিক্ষকদের বাড়িতে থাক্‌ত আর মোটা হাতে ঘুষ দিত; সামরিক কর্মচারীর পত্নী সৈন্য সংগ্রহের সময় পদপার্থিদের কাছ থেকে ঘুষ নিতেন তাদের টাকায় মদ খেতেন,—একদিন তিনি এত মদ খেয়েছিলেন যে গির্জাতে প্রার্থনা করার জন্য তিনি যখন হাঁটু গেঁড়ে বসেছিলেন তখন আর তার উঠবার সামর্থ্য ছিল না; সৈন্য সংগ্রহের সময় ডাক্তাররাও ঘুষ নিত; মিউনিসিপ্যালিটির ডাক্তার এবং পশু চিকিৎসক কসাইদের কাছ থেকে এবং বেশ্যাদের কাছ থেকে ঘুষ নিত; ধর্মের ক্ষেত্রেও ছিল তাই—উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ নীচের ধর্মযাজকদের কাছ থেকে উৎকোচ নিতে কসুর করত না; সহরের কাউন্সিলের কাছে যারা কোন কাজ নিয়ে যেত তাদেরও রক্ষা ছিল না: "মানুষ অন্ততঃ একটা ধন্যবাদও আশা করে"—তারপরেই চল্লিশটি কোপেক্‌ হাত বদ্‌লাত। যারা ঘুষ নিত না যেমন হাইকোর্টের কর্মচারীরা—তারা কঠিন এবং অহঙ্কারী হ'ত; দুই অঙ্গুলের সাহায্যে করমর্দন করত এবং উদাসীন ও সংকীর্ণমনা ব'লে তাদের কুখ্যাতি ছিল।

ক্রমশঃ

বাংলা সিনেমার দুর্দিন

সাগরময় ঘোষ

সিনেমা-সম্পাদক 'দেশ'

বাংলা সিনেমা শিল্পের যে দৈন্য আজ আমাদের লজ্জা দিচ্ছে তার কারণ সম্পর্কে যে আলোচনা গত সংখ্যায় কাহিনীকার ও পরিচালকদের প্রসঙ্গে এসে থেমে গিয়েছিল আজকের আলোচনা সেইখান থেকেই সুরু হোক্।

ইদানীং বাংলা ছবির পরিচালকদের মধ্যে সামাজিক মতবাদ প্রচারের একটা চেষ্টা দেখা যাচ্ছে কিন্তু অস্বাভাবিক রকম বিলাতী মতবাদ অনুকরণের প্রয়াস থাকায় সে সব ছবিতে যে সমাজের আবির্ভাব হয় তা বর্তমান বাংলার সমাজ তো নয়ই ভবিষ্যৎ বাংলার হলেও তা'কে দূষিত বলতে হবে। এ যেন তেলে জলে মিশ খাওয়ানোর জোর জবরদস্তি। আমেরিকার আকাশের ধার করে আনা মেঘ থেকে বাংলার মাটিতে বৃষ্টি ঝরিয়ে চাষ হবার মতো। উদাহরণ স্বরূপ 'পরাজয়' চিত্রে দেখা যায় রাঁচিতে কতকগুলি যুবক যুবতী প্রেম করতে, নাটক করতে, আর পিক্‌নিক্ করতেই অবাধ মেলামেশা কর'ছে; 'তটিনীর বিচার' ছবিটির আগাগোড়া উদ্ভট অসম্ভব কল্পনা ও ঘটনায় আচ্ছন্ন, 'আলোছায়া চিত্রটিতে' 'সাইকোলজি'র জন্যে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে, 'পথ ভুলে' চিত্রে নায়িকার ব্রিচেস্ প'রে সিঁড়ির রেলিংএর উপর বসে দোতালা থেকে একতলায় নামা বাংলা সমাজে চলে বলে অন্ততঃ আমার জানা নেই। এসব দৃশ্যে প্রদমিত যৌন-ক্ষুধা চরিতার্থ হতে পারে, দর্শকদের চিত্তবৃত্তিকে সুস্থতা দান করতে পারেনা। সামাজিক ছবির নাম করে এই যে বিলিতি সমাজের বিকৃত অনুকরণের চেষ্টা এর জন্যে পরিচালকরা যতখানি দায়ী ঠিক ততখানিই দায়ী আধুনিক বাংলার চিত্র-গল্প লেখকরা। বাংলা দেশের সমাজ-প্রকৃতি জানবার চেষ্টা কোন লেখকের নেই, চিত্র-পরিচালকদের এ চেষ্টা আরোও কম। বিদেশী গল্প আত্মসাৎ ক'রে দেশী গল্পের নামে চালাতে গেলে তা কখনই ফলপ্রসূ হতে পারে না। দর্শকদের মন থেকে সিনেমার প্রাথমিক মোহ কেটে গেলেই কাহিনীকার এবং পরিচালকের এই ফাঁকি প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। বিলাস ব্যসনপূর্ণ জীবনের কাল্পনিক আলেখ্য দেখানো বা জামা কাপড়ের অদ্ভুত ফ্যাসান প্রবর্তন করাই সিনেমাব কর্তৃপক্ষদের একমাত্র কর্তব্য হয়ে উঠেছে, যেন বাংলা

দেশের নিজস্ব সমস্যা নেই, আশা নিরাশা ও সংগ্রাম নেই, যেন তা গল্পের উপাদান হতে পারে না, গল্পের উপাদান কেবল ড্রয়িংরুম, পিয়ানোর টুংটুং, মোটরগাড়ি আর বিলিতি পোষাক। মুষ্টিমেয় কয়েকটি বাঙালী পরিবারে বিলিতি আবহাওয়ার পালিশ লেগেছে, বাংলার বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই, তথাপি বাংলা চিত্র সেই মুষ্টিমেয়কে নিয়েই ব্যস্ত। বাংলার সমাজ-জীবনের সত্যকার রূপ ফুটিয়ে তুলতে যে অনুভূতি, দরদ ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় তার অভাব চিত্র-গল্প লেখক ও পরিচালকদের মধ্যে খুবই বেশী এবং সেই কারণেই হিন্দী ছবি আজ আমাদের লজ্জা দিচ্ছে।

স্টুডিও চিত্রগল্প লেখকরা প্রথমতঃ সাহিত্যিক নন ফরমাসি গল্প লেখার জন্যে তাঁরা বাঁধা মাইনে পান, সমাজিক বা রাজনৈতিক কোন দৃষ্টি তাঁদের নেই; না থাক, কিছু এসে যেত না; কিন্তু তাঁরা বাংলা দেশকে ভুল্‌লেন ভারতবর্ষকে ভুললেন দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদেশকেও জানেননা, সমস্ত চিন্তার ক্ষেত্র এসে পড়ল গুটিকয়েক স্টুডিওর লোকের মধ্যে—সাইগল-কানন-ফলে এরাতো সবাই স্যুট্ পরলেনই বিকৃত এস্থেটিকের সৌকর্যও তাতে ফুটে উঠলো,—সোফা বড়বাড়ি, গেট্, দারোয়ান, বিলাস। এ যেন বাংলা নয় মস্ত ক্লাবের খেয়াল খুসী। তারই পরিণাম অভিনেত্রী, তারই পরিণাম নর্তকী।

এরা কাহিনীকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করেছেন, তাদের উপেক্ষায় নিজেরা যে মৌলিক মনস্তাত্বিক গবেষণা সুরু করলেন তার পাশে হিন্দী গল্প অনেক মহত্তর মনে হতে লাগল। তার কারণ, জনসাধারণের চিত্তের প্রতি হিন্দী চিত্রের অশ্রদ্ধা নেই। কোন চিত্র জনপ্রিয় হতে পারে তা জানবার সুযোগ বাংলাচিত্র নির্মাতারা পেয়েছেন কিন্তু বুঝতে পারেন নি। ইংরাজী ছায়াচিত্রগৃহে বাঙালীদের ভিড় কম, টকির কল্যাণে ইংরাজী সংলাপ বোঝা যায় না। কিন্তু আজ বাঙালীরা বাংলাচিত্র ছেড়ে হিন্দী চিত্র দেখতে যাচ্ছে; অথচ নিজেরা কেউই হিন্দী পণ্ডিত নয়। কাহিনীর দিক দিয়ে যদি বাংলা চিত্রকে উন্নত হতে হয় তবে পরিচালকদের প্রকৃত সাহিত্যিক কাহিনীকারের সঙ্গে অসহযোগিতার অস্বাস্থ্যকর অভিমান ছাড়তে হবে। পরিচালনার কৃতিত্ব কাহিণীকারের চাইতে এক তিল কম নয়; অর্থ্যাৎ এক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের কো-অর্ডিনেশন চাই, নিজের ভেতর সমস্ত কিছুর ইনকরপোরেশন নয়। সমষ্টিবুদ্ধির ঔদার্য না থাকলেই এ বিপর্যয় ঘটে। কাহিনী ঐতিহাসিক, সামাজিক বা মনস্তাত্বিক হতে পারে; পৌরাণিক গল্প জনপ্রিয় করা আজকাল শক্ত। জীবনীমূলক চিত্রও চল্‌তে পারে কিন্তু বাংলায় তেমন ক্ষমতাশালী পরিচালক বা অভিনেতার অভাব আছে একথা বল্‌তে লজ্জা করে। যা চাইনা তা হচ্ছে স্টুডিওমস্থিত অভিনেতা অভিনেত্রীর অভীপ্সার ছায়াপাত। কাহিণীকার যদি ভাল চিত্রনাট্যকার না হন তার আর কারও সহযোগিতার

আশ্রয় নিতে হবে। কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার যদি এক ব্যক্তি হনও তবু আমাদের অনুরোধ, কেউ যেন বাংলাচিত্রে আপাততঃ চার্লি চ্যাপলিনের অনুকরণ করবেন না।

পরিচালকের কাহিনী আপাততঃ থাক। কাহিনীও স্বষ্টি, পরিচালনাও স্বষ্টি এ বোধ না জাগলে পরিচালকের মনে সব সময় একটা ক্ষুদ্রতাবোধ (inferiority complex) জেগে থাকতে বাধ্য। এ বোধ বিষম সর্বনেশে। বাংলাচিত্রে এ ক্ষুদ্রতাবোধের পাল্লা চলেছে এবং তা অভিনয়ক্ষেত্রেও সংক্রামিত হতে চলেছে। তাই অভিনেতারা ও গল্প লিখতে চান অথবা মনে করেন অভিনয় একটা পৃথক স্বষ্টি নয়। কাহিনী, পরিচালনা, অভিনয় স্বষ্টির এই তিনটী ক্ষেত্রে কারো কাউকে ঈর্ষা করবার কিছুই নেই। যার যার প্রতিভা স্ফুরণের অবসর যার যার একান্ত ও পৃথক অথচ এই ব্যাপ্তিকে না মেনে উপায় নেই। তেমনি আলোকচিত্র গ্রহণ। কাহিনী সে পুস্তকের পাতায় অক্ষরের মধ্যে মূক, নিশ্চল, নিরুপায়; পরিচালিত অভিনয়ে সে কাহিনী বাক্‌স্ফূর্তি পায়; কিন্তু এই ক্ষণিক নাট্যমঞ্চকে সচল সজীব ঘটনায় প্রতিমূর্ত করে তুলতে যে পারে সে আলোকচিত্র-সেফুলয়েড প্রবাহ। স্বষ্টির কৃতিত্ব এর ও আর সকলের সমান স্তরে। কাহিনী, পরিচালনা, অভিনয় ব্যর্থ ও শ্রীহীন হতে বাধ্য যদি আলোকচিত্রে নৈপুণ্য ও প্রতিভাস্পর্শ না থাকে। যাকে বলে angle of vision; ঘটনাপ্রবাহ যে 'দৃষ্টি-কোণ' থেকে দেখা যাবে; আলোকচিত্রকার সমগ্র দর্শককে এমন একটা চশমা পরিয়ে দেবেন যে ঘটনাবৈচিত্র তার পক্ষে পীড়াদায়ক না হয়, উপলব্ধির পথ খুলে যায়। সমস্ত দর্শককে এই দেখবার যন্ত্রটি হাতে দিয়ে আলোকচিত্রকার নেপথ্যে যান, তখনই অভিনয় তখনই কাহিনী বুঝতে পারা যায়।

এমন স্বায়ত্তশাসন পেয়ে কারও কোনো নালিশ থাকতে পারে না; কিন্তু সমগ্রতার সাধনায় বা প্রকৃত জাতীয়তার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত না হলে সবকিছু অসংলগ্ন ঠেকবে, লাগবে মারামারি আর্থিক ক্ষেত্রের মতো দরকার হবে protective walls, স্বরু হবে অস্ত্র হানাহানি।

আর একটা কথা আছে। জনসাধারণের প্রতিনিধি যখন পরিষদে দাঁড়িয়ে "সরকার পক্ষীয়"কে প্রশ্ন করেন তখন সরকার পক্ষ (জনসাধারণের পক্ষ নয়) জনসাধারণের প্রতিনিধিকে বলেন "জনসাধারণের নিরাপত্তার দিকে তাকিয়ে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সরকার পক্ষ সঙ্গত মনে করেন না।"—এই আমলাতান্ত্রিক (স্টুডিও) মনোবৃত্তি ছেড়ে পরিচালকেরা একবার দেশের জনসাধারণে নেমে আসুন, যেখানে পাওয়া যায় মাটীর গন্ধ, যার নীচে আছে রস, আছে জনপ্রিয়তার মূল শেকড়।

পরিচয়

গ্রন্থ

ক্রান্তি (সঙ্কলন গ্রন্থ)—নতুন সাহিত্য ভবন, ঢাকা। দাম আট আনা।

গল্প প্রবন্ধ ও কবিতা এক সঙ্গে সংগ্রহ করে ঢাকা জিলা প্রগতি লেখক সঙ্ঘ এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। যাঁরা নতুন সাহিত্যের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করতে চান্ এ-গ্রন্থে তাঁদেরই আত্মপ্রচার আছে। প্রায় দশটি কবিতা আছে মৌলিকে আর অনুবাদে জড়িয়ে—কিন্তু কবিতা কয়টি তেমন জমাট নয়। চারটি গল্পের মধ্যে 'বনস্পতি' বেশ ভালো লাগলো তার ধারাবাহিক কাহিনীর প্রকাশ-সৌন্দর্য্যের জন্য। 'বাংলা কাব্যের গতি' প্রবন্ধটি সুচিন্তিত না হ'লেও সুলিখিত হয়েছে।

একদিনেই লেখায় হাত পাকে না, চিন্তা ও চেষ্টার সংমিশ্রণে যদি অনুশীলন চলে, তবে এই লেখক সঙ্ঘের কয়েকজন সভ্য একদিন সুলেখক বলে পরিচিত হবেন, তার আভাষ পাওয়া যায়।

দাবী—তড়িৎ কুমার বসু। শ্রীঅনিলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী কর্তৃক ১৯০।২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ বালিগঞ্জ থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা আট আনা।

বইটার মলাটে লেখা আছে—'নবরূপী কথা-সাহিত্য।' পরিচয়-পৃষ্ঠায় লেখা আছে—'চিত্র-নাট্য-রূপী কথা-সাহিত্য'। সাহিত্য কা'কে বলে বোঝা গেলোনা, কেননা সাহিত্য বলতে যা বুঝি এ-বই তার সগোত্র নয়। এটা অসম্ভব একটি গল্পকে কেন্দ্র ক'রে সিনারিও ছাড়া আর কিছু নয়। লেখক ছায়াচিত্রের পরিচালক. বর্ত্তমান বাংলার সিনেমা-দুর্দিনে তাঁর পরিচালনায় যদি দু'চারটি ভালো বই বেরোয় তাহ'লে আনন্দ পাব—কিন্তু এ-'বই' মানে পুস্তক নয়—নিছক ছায়াচিত্র। আলোচ্য গ্রন্থটি না-নাটক, না-উপন্যাস, না-রূপকথা, কোন নাম ধ'রে একে ডাকবো?

মঞ্জু সেন

আমাদের সাহিত্য—অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন। প্রকাশক: ভারতী ভবন, ১১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

জাতীয় সাহিত্য যে জাতির পরম গৌরবের বস্তু একথা বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। কোন জাতিকে ভালভাবে বুঝতে হ'লে তার সাহিত্যের সংগে পরিচয় থাকা নিতান্ত দরকার। দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি জাতীয় জীবনের সম্যক্ পরিচয় দিতে পারে না: তার কারণ এগুলো প্রাণহীন কাঠামো মাত্র—জাতির অন্তর্লীন প্রাণপ্রবাহের রসে তারা সঞ্জীবিত নয়। একটা মরা মানুষের সংগে জীবন্ত মানুষের যে-তফাৎ, দর্শন-ইতিহাস-বিজ্ঞানের সংগে সাহিত্যের সেই তফাৎ। আমার এই মন্তব্যে কেউ যেন মনে না করেন যে দর্শন ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি কখনও সাহিত্যের পর্য্যায়ে উন্নীত হ'তে পারে না: এরা সাহিত্য হ'তে পারে কেন, হয়েছেও—তবে তার জন্যে অমানুষী প্রতিভা এবং

প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো হ'চ্ছে কাঠামো মাত্র—প্রাণহীন নিশ্চল জড়ের স্তূপ। কিন্তু সাহিত্য সজীব চলমান—জাতির বৈশিষ্ট্য এবং চরিত্র তার সাহিত্যের মধ্যে নিবদ্ধ। ইংলণ্ডের দশটি ইতিহাস প'ড়ে এলিজাবেথীয় যুগের সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা জন্মে না, শুধু মাত্র সেক্‌স্‌পীয়ারের নাটক পড়ে আমাদের সে ধারণা জন্মে : এর একমাত্র কারণ সেক্‌স্‌পীয়ার ছিলেন সাহিত্য-শিল্পী—তাঁর নাটকে তাই জাতির প্রাণের প্রতিফলন আছে। প্রত্যেক দেশ এবং জাতির সাহিত্য সম্বন্ধেই একথা খাটে। জাতীয় জীবনের আশা আকাংখা সুখ দুঃখ এবং বৃহত্তর সাধনার পরিচয় পাওয়া যায় জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে। জাতীয় সাহিত্যের আলোচনা তাই এত মূল্যবান।

আমাদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস অনেকেই রচনা করেছেন : তবু বাংলা সাহিত্যের আলোচনা যথেষ্ট পরিমাণে হ'য়েছে বলে মনে করবার কারণ নেই। আমরা যদি ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস পড়্‌তে চাই, তবে এত বই এসে আমাদের হাতের কাছে ভীড় করে যে কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা পড়বো—ভেবে ঠিক করা মুস্কিল হয়। কত পণ্ডিত কত মনীষী যে ইংলণ্ডের সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন তার ইয়ত্তা নাই : নানা মূল্যের নানা আকৃতির বিচিত্র এই সব সাহিত্য-ইতিহাস ! এর দ্বারা এ-ই প্রমাণিত হয় যে ইংরেজ জীবন্ত জাতি : তার সঞ্চরণ-শীল জাতীয়-জীবনে সাহিত্যের প্রেরণা তাই অপরিহার্য। এদিক্‌ দিয়ে তুলনা করতে গেলে আমাদের সাহিত্যের আলোচনা এখনও যথেষ্ট সীমাবদ্ধ। বাংলা সাহিত্যের যে কয়খানি প্রামাণ্য ইতিহাস আছে তা' হাতে গুণে শেষ করা যায়। এই বইগুলির বেশীর ভাগই আবার গবেষণামূলক এবং অনাবশ্যক পাণ্ডিত্যের চাপে ভারাক্রান্ত। গবেষক পণ্ডিত ও সাহিত্যের ছাত্র ছাড়া এই বইগুলি সাধারণ পাঠকের কাজে বড় লাগে না : পাণ্ডিত্যের বহর দেখে সাধারণ পাঠকের ভয় পাবারই কথা। এই সাধারণ পাঠকদের জন্য একটি সরল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রয়োজন ছিল। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের "আমাদের সাহিত্য" সে প্রয়োজন মেটাতে পারবে ব'লেই আমার বিশ্বাস। তা ছাড়া বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করবেন ব'লে স্থির করেছেন, তখন ছাত্রদের পক্ষে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সংগে পরিচয় থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এদিক্‌ দিয়েও বইটির প্রয়োজনীয়তা আছে যথেষ্ট।

গ্রন্থকার অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন পণ্ডিত লোক : বাংলা সাহিত্য-সমালোচনায় তাঁর সমধিক খ্যাতি আছে। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থ তাঁর পাণ্ডিত্যের নিদর্শন নয় : প্রকৃতপক্ষে পাণ্ডিত্যের গুরুভার না থাকাতেই "আমাদের সাহিত্য" মূল্যবান হয়ে উঠেছে। লেখক এবিষয়ে যথেষ্ট আত্ম-সচেতন : তাই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন : "পণ্ডিতদের কাছে বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই পুস্তকে গবেষণার নামগন্ধ নাই।" এ হিসাবে তাঁর গ্রন্থ-রচনা সার্থক হয়েছে। তরুণ প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে বইটি খুব উপযোগী : এই বইটি পড়ে তারা ভবিষ্যতে বড় বড় গবেষণামূলক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠে অনুপ্রেরণা পাবে। গ্রন্থকার সরল মনোজ্ঞ ভাষায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। নেহাৎ কম হলেও বাংলা সাহিত্য যে এক হাজার বছরের পুরণো সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি এই হাজার বছরের জটিল সাহিত্যের ইতিহাস স্বল্প-পরিসর এই বইটিতে অতি নিপুণভাবে আলোচনা করেছেন : বৌদ্ধগান ও দোঁহা থেকে সুরু করে শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত তিনি বাংলা সাহিত্যের একটা

ধারাবাহিক প্রাণ-পরিচয় দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর প্রয়াস যে বহুলাংশে সাফল্যলাভ করেছে তা সুনিশ্চিত। বইটি প'ড়ে বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের একটা মোটামুটি কাজ চালানো জ্ঞান জন্মে। সাধারণ পাঠকের পক্ষে এই জ্ঞানই বোধ হয় যথেষ্ট। একটি বিষয়ে আমার আপত্তি আছে : গ্রন্থকার শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত এসেই তাঁর আলোচনা শেষ করেছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের পরেও বাংলা সাহিত্যে অনেক প্রতিভাবান্ কথা-শিল্পী ও কবির আবির্ভাব হ'য়েছে : তাঁরা ইতিমধ্যে সাহিত্য-জগতে স্থায়ী আসনও লাভ ক'রেছেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁদের অবদান উপেক্ষনীয় নয় : এই অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের সাহিত্য প্রচেষ্টাকে অবলম্বন করে লেখক যদি গ্রন্থের শেষ আরেকটি অধ্যায় সংযোজিত করতেন, তবে বইটি সর্বাংগীন সুন্দর হ'ত বলেই আমার বিশ্বাস। আশা করি ভবিষ্যৎ সংস্করণে বইখানির এই ত্রুটি সংশোধিত হবে। দু'একটি ছাপার ভুল ছাড়া বইখানির বিরুদ্ধে বলবার মত কিছু নেই। বিষয়-বস্তুর সুরবিন্যাস, মুদ্রণ-পারিপাট্য এবং অংগ-সজ্জায় বইটি হয়েছে অনিন্দ্যনীয়। এরূপ অল্প মূল্যে এমন সুন্দর সহজ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বাজারে আছে বলে আমার জানা নেই। পাঠকমহলে—বিশেষ করে ছাত্রমহলে—বইটি সমাদৃত হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

গোপাল ভৌমিক

ছায়াচিত্র

রাজনর্তকী

'রাজনর্তকী'র কাহিনীকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় কিঞ্চিৎ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সুন্দরী রাজনর্তকীর জীবনকে কেন্দ্র ক'রে যে গল্প গড়ে উঠেছে, তার জন্যে রচয়িতা অবশ্যই প্রশংসা পাবেন। এবং এই সঙ্গে বলে রাখা দরকার যে রাজনর্তকীর জীবন যে পরিণতিতে এসে থেমে গেল, তা অতিরিক্ত স্বাভাবিক হ'লেও এ-ক্ষেত্রে তেমন জমাট হ'লো না। তার জীবন এইভাবেই শেষ হবে—আমরা এই আশা বা আশঙ্কা নিয়েই বসে ছিলাম, কিন্তু আশা থাকলেও আমরা মনে মনে এ-পরিণতি চাইনি। সাধারণ গণিকাজীবন এই ভাবেই শেষ হয়, আমরা একটু অসাধারণত্ব চেয়েছিলাম। এই ট্র্যাজিক সমাপ্তি সত্বেও কোথায় যেন সামান্য ত্রুটির জন্যে মনের ওপর শেষ দৃশ্যটি গভীর রেখাপাত করতে পারলো না। হয়ত এর জন্যে দায়ী পরিচালক মধু বসু। মৃত রাজনর্তকী (সাধনা বসু)-র পরিপূর্ণ নিষ্প্রভ মুখটি মনের মধ্যে গেঁথে দেবার জন্যে ক্লোজ-আপের শরণাপন্ন হ'লে হয়ত ভাল হ'তো।

সুন্দরী মণিপুর-রাজনর্তকী ভালবেসেছিলো মণিপুর-রাজকুমারকে। এই ভালবাসাই উভয়ের জীবনকে তিক্ত ক'রে তুললো। কেননা, রাজকুমার একটি নর্তকীকে বিবাহ ক'রে রাজমহিষী করবে—প্রজারা তা চায় না, রাজা তা চায় না। নর্তকীকে কুলপুরোহিত বুঝিয়ে দিলেন, সে কত বড় অঘটন ঘটাতে চ'লেছে : এতে নর্তকী বুঝলো, এবং রাজকুমারকে নিরাপদ করার জন্যে নিজে যে স্বার্থত্যাগ

করলো, তা আদর্শস্থানীয়ই বটে। রাজকুমার-বেশী জ্যোতিঃপ্রকাশের অভিনয় পুরুষালী নয় : তিনি মেয়েলী ঢঙে কথা বলেন ও প্রেম-নিবেদন করেন। এই ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁর অভিনয় নেহাৎ নিকৃষ্ট শ্রেণীর নয়। সাধনা বসু নৃত্যে ও অভিনয়ে চরম নিপুণতা দেখাতে পেরেছেন কিন্তু তাঁর কণ্ঠসঙ্গীতে আমাদের আশানুরূপ পরিতুষ্ট করিতে পারেন নি। প্রতিমা দাশগুপ্তা (হক) সর্ববাদীসম্মতক্রমে একজন শক্তিমতী অভিনেত্রী—এ-চিত্রে তিনি তাঁর কৃতিত্ব দেখাবার তেমন সুযোগ পান নি। কিন্তু যেটুকু পেয়েছেন তার মধ্যে সামান্যতম ত্রুটি আমাদের চোখে পড়ে নি।

প্রীতি মজুমদার ও বিভূতি গাঙ্গুলী আমাদের প্রচুর হাসিয়েছেন। এঁদের দু'জনের অভিনয়ই বেশ উৎরেছে। এঁদের চালচলন কথাবার্তা হাবভাব ও সর্বশেষে গম্ভীর রসিকতা আমাদের ভালো লাগলো। কিন্তু মন্দিরের পুরোহিত (রাজপুরোহিত নয়) আমাদের হতাশ ক'রেছে : সঙ্গীতে ও অভিনয়ে। রাজ-পুরোহিত অহীন্দ্র চৌধুরীর কথা বেশী লেখা নিষ্প্রয়োজন। তাঁর গম্ভীর মূর্তি সদাচারী চেহারা ও কথন-প্রণালীর মধ্যে প্রকৃত রাজ-পুরোহিতের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছে! চিত্রের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাঁর যে-আচরণ প্রকাশ করেছেন তা কেবল তাঁর কাছ থেকেই আশা করা যায়।

ভূমিকা নির্বাচন মন্দ হয়নি। পরিচালনার ত্রুটি বেশি নেই : কেবল পর্বতচূড়ার মন্দিরের পুরোহিতের কথা বাদ দিয়ে এবং সেই সঙ্গে মণিপুর-রাজার [কাহিনীকার (?)] কথা বাদ দিয়ে। চিত্রটি যদি কেউ খারাপ বলে তা হলে তার জন্য দায়ী এঁরা দু'জন।

এক কথায়, রাজনর্তকী চিত্রটি ভালো হ'য়েছে : নিছক আনন্দ দান করার দিক থেকে চিত্রটি প্রথম শ্রেণীর বটেই। কিন্তু আমাদের কথা এই-যে ছায়াছবির মুখ্য উদ্দেশ্য কি? কেবল মন-ভুলানো কতকগুলি দৃশ্য ও চিত্তাকর্ষক কতকগুলি অঙ্গভঙ্গী দেখানই যদি চলচ্চিত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তা'হলে আমাদের বলার কিছু নেই। কিন্তু গঙ্গার ঢেউ গণনা, আকাশের তারার কম্প'নও আমাদের মধ্যের অনেককে আনন্দ দিতে পারে, তাহ'লে ছায়া-চিত্র কি তাদের জন্যে নয়? চিত্রের মধ্যস্থতায় আমরা আমাদের সমাজ-চিত্র দেখতে চাই তার ত্রুটি বিচ্যুতির কথা জানতে চাই এবং সেই ত্রুটি শোধনের পন্থা দেখতে চাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোনো চিত্রই আজ পর্য্যন্ত এ উদ্দেশ্য-সাধনে প্রয়াসী নয়।

যাই হোক, আমরা মধু বসুকে অভিনন্দন জানাচ্ছি; উত্তরোত্তর তাঁর পরিচালনা কৃতিত্ব বাড়ছে দেখে আশা করি এর পর থেকে তিনি আমাদের সম্মুখে আমাদের জীবনের জটিলতার বাস্তবরূপ দেখাবেন।

রাজনর্তকীর চিত্রগ্রহণ শব্দযোজন ও দৃশ্য-পরিকল্পনা ভালো হয়েছে।

বিজয়িনী

'বিজয়িনী'র সমালোচনা লেখার সময় সর্বাগ্রে মনে পড়ে এই চিত্রের প্রধানা নায়িকা শ্রীমতী চন্দ্রাবতীর কথা। চন্দ্রাবতীকে বরাবরই আমরা সুনজরে দেখে এসেছি—'দেবদাস' চিত্রে চন্দ্রমুখীর ভূমিকাভিনয় ক'রে এঁর খ্যাতি বিশেষভাবে বেড়ে যায়। সকলেই স্বীকার করে যে চন্দ্রাবতী প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী। অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দায়িত্ব কম নয়। চরিত্রকে যথোচিত রূপায়িত করার

ভার এঁদের। কিন্তু, আলোচ্য চিত্র দেখে মনে হ'লো, চন্দ্রাবতীর দায়িত্ব-বোধ বিন্দুবিসর্গও নেই। তিনি যেন অনুগ্রহ ক'রে এই ভূমিকাটি অভিনয় ক'রে দর্শককে ও প্রযোজককে ও পরিচালককে কৃতার্থ ক'রে দিয়েছেন। তাঁর ভূমিকাটি আগাগোড়া করুণ রস-সিক্ত। এই চরিত্র রূপায়নের ভার নিয়ে তিনি প্রত্যক্ষে দেখাচ্ছেন দুঃখের অভিনয়, পরোক্ষে মিটিমিটি হাসছেন। চিত্রের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত তিনি এই ব্যবহার বজায় রেখেছেন। এর হেতু কি? ক্যামেরার পাশে দাঁড়িয়ে কেউ কি তাঁর সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করছিলো?

রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় ভালো হয়েছে: কাহিনীকার অথবা সংলাপ-রচয়িতার দোষে মাঝে মাঝে তাঁকে হাস্যাস্পদ হ'তে হয়েছে অবশ্য, কিন্তু তার জন্যে দায়ী তাঁকে করা চলে না। কার্টেন-লেক্চার কখনোই পাব্লিক প্লাটফর্মে চলে না। প্রেম-নিবেদনের গোপন-কথাগুলি ও-ভাবে প্রকাশ্যে বলাতে গিয়ে পরিচালক নিজের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন নি। আগাগোড়া বইটা তাই জ'লো হ'য়ে গেছে। সন্তোষ সিংহ একমাত্র অভিনেতা, যিনি কি-ধরণের চরিত্র নিয়ে নিজে নেমেছেন তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাঁর বাউণ্ডুলে-ভাব ও জীবন-সংগ্রামের ক্লান্ত সৈনিক-বেশ আমাদের মুগ্ধ ক'রেছে। জহর গাঙ্গুলী এ-বাজারে অচল ব'লেই জানতাম; কিন্তু এখানে তিনি কিছুটা সুঅভিনয় ক'রে দুর্নাম লাঘব ক'রেছেন। সত্য মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে মাষ্টার মহাশয়ের ভূমিকাভিনয় করানোর সার্থকতা বোঝা গেলো না। তিনি হাস্যকৌতুকের রাজা, গম্ভীর ভূমিকায় তিনি অকৃতকার্য্য হবেন, এতে আর আশ্চর্য্য হবার আছে কী?

পরিচালক তুলসী লাহিড়ির দাড়-বেশ মনোমুগ্ধকর। শান্ত, ধীর ও সরল তাঁর প্রকৃতি, এই ভূমিকাটি মনে রেখাপাত করতে পেরেছে। কমলা ঝরিয়ার গান কয়টি সুগীত হয়েছে। এক কথায় 'বিজয়িনী' দেখে আমরা আশানুরূপ আনন্দলাভ করিনি। শব্দগ্রহণ ও চিত্রগ্রহণ চলনসই।

বাঙলার মেয়ে

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 'পথের শেষ' উপন্যাস অবলম্বনে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী 'বাঙলার মেয়ে' নামে যে-নাটক রচনা করেছেন, আলোচ্য চিত্রটি সেই নাটকের পর্দা-সংস্করণ।

মঞ্চের মসলা পর্দায় আনলে যে-দোষ সর্বাগ্রে চোখে পড়ে, প্রথমেই সেই দোষের কথা উল্লেখ ক'রে আলোচনা আরম্ভ করলাম: চিত্রটি আগাগোড়া মঞ্চ-ঘেঁষা হ'য়ে প'ড়েছে। মঞ্চ-ঘেঁষা হবার আরো একটা কারণ এই যে কয়েকজন খ্যাতিমান মঞ্চাভিনেতা এই চিত্রের ভূমিকাভিনেতা। এ ত্রুটি সত্বেও চিত্রটি তৃতীয় শ্রেণীর নয়। অভিনয়ের দিক থেকে এর উৎকৃষ্ট দর্শকদের আকর্ষণ করে। বাঙলা চিত্রে অভিনয়-কলা তেমন ধর্তব্যের মধ্যে ধরা হয়না। কিন্তু আলোচ্য চিত্রটি সে অপযশের হাত থেকে মুক্ত।

তিনকড়ি চক্রবর্তীর উপেন্দ্র-রূপ অতি স্বাভাবিক ও উজ্জ্বল হ'য়েছে। উপেন্দ্রকে রূপায়িত ক'রে তিনি তাঁর নিজস্ব সুনাম বজায় রাখতে পেরেছেন। জিতেন-বেশী নরেশ মিত্রের অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য, নরেশবাবু শক্তিমান অভিনেতা ব'লে স্বীকৃত, তাঁর কাছ থেকে আমরা হয়ত আরো একটু বেশী আশা ক'রেছিলাম। কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এবং সন্তোষ সিংহ উভয়েই নিজ নিজ দায়িত্বের কথা স্মরণ রেখে

নিজেদের কর্তব্য সুসম্পন্ন করতে পেরেছেন। সন্তোষ সিংহের মিষ্টার চাটার্জি ও কৃষ্ণধনের সুরেশ আমাদের প্রশংসার দাবী করে। ধীরাজ ভট্টাচার্যের মেয়েলি-ভাবটুকু বাদ দিলে তাঁর অভিনয় নেহাৎ নিকৃষ্ট হয়নি। ছবি বিশ্বাস দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণের সুযোগও বিশেষ পাননি, তাই হয়ত তাঁর কথা তেমন মনে প'ড়ছেনা।

স্থূলভাবে পুরুষ-ভূমিকা সম্বন্ধে এই পর্যন্ত আলোচনা করা চলে। স্ত্রীভূমিকার মধ্যে লীলা হালদারের অভিনয়ের দিক থেকে নৃত্যটুকুই আনন্দপ্রদ। ইন্দিরা রায়ের অভিনয় যথার্থই ভালো হ'য়েছে। তিনি যে ভাবে অত্যাধুনিক উগ্র বিলাসিনীর চরিত্র চিত্রিত ক'রেছেন, তার জন্যে তিনি আমাদের প্রশংসা দাবী করতে পারেন। পদ্মাদেবী ও উষাবতীর ভার ছিলো দুঃখে জর্জ্জরিত দুটি চরিত্র ফোটাবার: এঁরা সে-কাজে অসফল হননি।

ভূমিকাভিনেতাদের কথা শেষ হ'লো। এবার সঙ্গীতের কথা ধরা যাক্। সঙ্গীতাংশ শ্রুতি-সুখকর হ'লেও আবহ সঙ্গীতের সুসাফল্যের অভাব-হেতু কোথায় যেন কিঞ্চিৎ অভাব বোধ হ'লো: মন খুঁত খুঁত করে।

পরিচালক নরেশ মিত্র এ-চিত্রের সাফল্যের জন্য আমাদের প্রশংসা পাবেন। আসল কথা, চিত্রটি দর্শক সাধারণের কাছে সম্মান পাবে, এ ভরসা আমাদের আছে।

দর্শক

নাটমঞ্চ

বর্ত্তমানে কলকাতায় পাঁচটি থিয়েটার চলচে। ষ্টার, মিনার্ভা, রঙমহল, নাট্যভারতী ও নাট্যনিকেতন। প্রথম দুটি সাড়ে চার আনার থিয়েটার, অর্থাৎ সিনেমার মত cheap place of amusementএর, আর শেষোক্ত তিনটি উচ্চাঙ্গের নাট্য-রস পরিবেশন করেন বলে আভিজাত্যের দাবী করেন। অবশ্য রসজ্ঞ দর্শক সাধারণ জানেন আভিজাত্যটা ফাঁকা ও bankruptcy চাল মাত্র—আসলে ওরা মাসতুত ভাই। তথাকথিত অভিজাত নাট্যালয়ে যে সকল নাটক অভিনীত হয় এবং যে স্তরের অভিনয় হয় তা চীপ থিয়েটার অপেক্ষা বিশেষ উঁচু দরের নয়। উভয় স্থানের শিল্পীবৃন্দের মধ্যে প্রায় সকলেই melo dramatic actor ও actress—ষ্টাণ্ট ও প্যাঁচ সকলেরই মেরে দেবার ব্রহ্মাস্ত্র। তারপর নাটকের দিক থেকেও আশ্বস্ত হবার মত কিছু নেই। সামাজিক নাটকের নামে অভিজাত নাট্যালয়গুলি যে সকল 'স্ববিশ' নাটক সদম্ভে মঞ্চস্থ করে চলেচেন তাতে দুর্দিনের কিছু উপশম হচ্চে না, বরঞ্চ আরও মারাত্মক হয়ে উঠচে। পরিণামটা ধীরে ধীরে আসে। বুকিং অপিসের প্রতি লক্ষ্য রেখেও কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারচেন না। এ দুর্দিন এসেচে সম্প্রদায় গত অন্যায় ও অবিমৃষ্য-কারিতার জন্যে। যেখানে ভানুমতি খেলা হয় অর্থাৎ চীপ্ থিয়েটারে, সেখানে যে অভিনয় হয় সে

সম্পর্কে আমাদের বলবার বিশেষ কিছু নেই। আমরা জানি সেখানে যে সব নাটক অভিনীত হয় তার মধ্যে মাঝে মাঝে ড্রামার সন্ধান পাওয়া যায় এবং তা অভিজাত আসরের স্ববিশ নাটকের চেয়ে স্থানে স্থানে যথেষ্ট বলিষ্ঠ হয়। সুসংস্কৃত ও রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ ওদের আবহাওয়া, হাস্যকর ভেলকিবাজি, অলৌকিক তাজ্জব ঘটনা সহ্য করতে পারেন না এবং একঘেয়ে কাহিনীর পুনরাবৃত্তি আর দেখতে চান না। আর্টের নামে যে রসিকতা হয় তা সত্যই সহ্য করা কঠিন হয়ে ওঠে। তবে এ প্রসঙ্গে আমরা বলব, চীপ্ থিয়েটারের প্রয়োজন রয়েচে। এদের খাঁটী দর্শক (টিকিট কেটে যারা দেখে) সংখ্যা প্রচুর। এ দুর্দিনে চীপ্ থিয়েটার থেকে বহু লোকের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হচ্চে। আর্থিক দিক থেকে এরা তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায় থেকে অধিক সচ্ছল।

ষ্টারে উষা-হরণ পর্ব শেষ হয়েচে। **Abduction of Miss Light** বলে কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন দেবার আর আবশ্যক হবে না। এদের নতুন নাটকার নাম 'কমলে-কামিনী', নাট্যকার হচ্ছেন শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত এম-এ। এবার শ্লীলতাহানির বিজ্ঞাপন পড়বে কিনা জানিনে। মহেন্দ্রবাবুর পৌরাণিক নাটক জমে ভাল, সম্ভবত নতুন নাটক কমলে-কামিনী হতাশ করবে না। মিনার্ভায় হচ্চে খ্যাতিমান নাট্যকার শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য বিরচিত কাল্পনিক নাটক 'কুহকিনী'। শচীনবাবুর হর-পার্বতীর মত এ নাটকটিও আমাদের হতাশ করেচে। বারান্তরে এর সমালোচনা করব।

রঙমহলে রত্নদীপ চলেচে শনি ও রবিবার, বুধবারে ঘূর্ণি এবং অন্যান্য বারে সম্মান ও বিশেষ-রজনী। ঘন ঘন বিশেষ-রজনী হওয়াটা থিয়েটারের পক্ষে মঙ্গলের কথা নয়। শনি ও রবিবারের জন্য এঁরা বিধায়ক বাবুর নতুন নাটকের তোড়জোড় করচেন। বুধবারের জন্য এখনও নাটক নির্বাচিত হয়নি। তবে শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে।

নাট্য-ভারতীতে শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়ের নতুন টেকনিকে লেখা 'পি-ডব্লিউ-ডি' নাটকটি সগৌরবে চলচে। শীঘ্রই এর হীরক-জয়ন্তী হবে। হীরক-জয়ন্তী হওয়া অতিশয় গৌরবের কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু নাটকটি সম্পর্কে আমাদের ভাল ধারণা নেই। আমরা বিষয়বস্তু সম্পর্কেই বলচি শুধু। অপরিচিত স্বামীজীকে এনে 'সতীত্ব' ও 'নারিত্বের' দীপ্তিতে উদ্ভাসিতা এক কুমারী নারীকে অন্তঃস্বত্তা করে দেওয়া সুরুচির পরিচয় দেয় না। অবশ্য স্বামীজী যে কোন কুমারী নারীকে অন্তঃস্বত্তা করে তারপর তাকে অশ্লীল গালাগালি করে শুচিতা রক্ষা করবার জন্যে সরে যেতে না পারেন তা' নয়। কিন্তু যে বিষয়টি নাটকের প্রধান সমস্যা ও ক্লাইমাক্স এবং যাকে কেন্দ্র করে নাটক একটি লক্ষ্যে পরিণতি লাভ করে, তাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তার জন্য সিচুয়েশন তৈরি করতে হয় এবং তার মনস্তত্বপূর্ণ যুক্তি থাকা চাই।

(নাট্য নিকেতনে প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরীর হাস্যরসাত্মক নাটক 'পরিণীতা'র কনক-জয়ন্তী হয়ে গেচে।) শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নতুন নাটক 'ভারতবর্ষ' মঞ্চস্থ হয়েছে। বিজ্ঞাপিত 'শ্রীমধুসূদন' দ্বিতীয় বারের জন্য ধামাচাপা পড়েচে।

সৌরীন্দ্র মজুমদার

সম্পাদকীয়

দেশভ্রমণ করলে নানাবিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। পত্রিকা-সম্পাদনা করলে নানাজাতীয় লেখকের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। জীবনের নানাবিধ লোকশানের মধ্যে এটা কম লাভ নয় : বিনা মাশুলে দেশভ্রমণের সামিল, ট্রেনের ধকল সহ্য করার পর নতুন দেশসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করার মতো। আমাদের মন সব সময়ই উন্মন, আত্মকেন্দ্রিক হ'য়ে নিরিবিলি ব'সে থাকতে সে নারাজ : গতানুগতিক পদ্ধতিতে ঠেলাগাড়ীর সওয়ারী হ'য়ে অত্যন্ত পরিচিত একই রাস্তা দিয়ে রোজ চলা সে পছন্দ করেনা। রোজ মুখ বদ্‌লানো তার ইচ্ছে। আমাদের মনের মানসিক ইচ্ছেটা অবশ্যই বেআড়া নয়। মনকে দু'ভাগে ভেঙে ফেলা যেতে পারে : মৃত মন ও জীবিত মন। জীবিত মনের রীতিই গতির আকাঙ্ক্ষা। যেহেতু মন গতি পছন্দ করে, মনের জন্যে সেই জন্যেই সিমেণ্ট-করা মসৃণ পথ-নির্মাণের প্রয়োজন নেই। ঠোকড় আর হোঁচট খেয়ে চলাতেই তার স্ফূর্তি।

●

আমাদের দেশে লোকে নিজেকে যত সহজে সাহিত্যিক ব'লে ঘোষণা করতে পারে, পৃথিবীর অন্য কোনো-দেশে হয়ত এত শিগগির পারে না। কলকাতার Writers' Building নামক দালানে যাঁরা দিন কাটান, তাঁদের সকলকেই অবিলম্বে সাহিত্যিক ব'লে ঘোষণা করা হোক্। দু'টি কবিতা ও তিনটি গল্প লিখে যাঁরা সাহিত্যিক হ'তে চান, তাঁরা এ-বিষয় একটু সাড়া তুলুন। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টা মিলিত হ'লে তাঁদের দল অবিলম্বেই ভারী হ'য়ে উঠবে। তারপর মেজরিটির গুরুভার নিয়ে তাঁরা লড়াই করুন, এ-বিষয় মিষ্টার ফজ্জলুল হকের পরামর্শ নিতে পারা যায়। বঙ্গের উদীয়মান লেখকদের জয় হোক্!

●

আনন্দের কথা এই-যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম জন্মতিথি উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত ক'রেছেন। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কোনো মনীষীর জন্মতিথি উৎসবের আয়োজন, আমরা যতদূর জানি, ইতিহাসে এই প্রথম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিবিধ বিষয়েই অগ্রণী। আশুতোষের প্রাণস্পন্দন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিরায় শিরায় এখনো নিশ্চয়ি ধ্বনিত হ'চ্ছে। রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উদ্‌যাপনের আয়োজন সেই স্পন্দনেরই জ্বলন্ত প্রমাণ।

●

বাঙলাদেশ স্মরণীয় ব্যক্তিকে স্মরণ, ও বরণীয়কে বরণ করতে শিখেছে। জীবিত কিংবা স্বর্গত উভয় শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিকে সম্মান দেখিয়ে বাঙলাদেশ নিজেই গৌরবান্বিত হ'চ্ছে। কৃত্তিবাস ওঝা রামায়ণ রচনা ক'রে যে-চিরস্থায়ী যশ অর্জন ক'রে গেছেন, সে-যশ এতদিন অনেকটা উপেক্ষিত ছিলো। মুদির দোকান থেকে আরম্ভ ক'রে সম্ভ্রান্ত অট্টালিকাতে রামায়ণ পাঠ নিত্যনিয়মিতভাবে চ'লে আস্‌ছে। গ্রন্থ-রচয়িতাকে সব চেয়ে বড় সম্মান যদিও গ্রন্থ পাঠ ক'রে গ্রন্থের উপযুক্ত সম্মান করা। মরক্কো চামড়ায় বাঁধাই ক'রে, মেহগনি কাঠের পালিশ-করা আলমারীতে সাজিয়ে রেখে অনেকে গ্রন্থের আদর করার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু সে-আদরের জলে চিড়ে ভেজেনা, সে স্নেহের তাপে খৈ-ও ফোটে না। যাঁরা এতদিন কৃত্তিবাসের সুললিত গীতিছন্দে আত্মহারা হ'য়ে কবি-রচিত শ্লোক পাঠ ক'রে আসছিলেন, আজ তাঁরা নতুন ভাবে কবিকে সম্মান করতে আরম্ভ করেছেন। তাঁর জন্মভূমি ফুলিয়া গ্রামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিক মিলিত হ'য়ে তাঁকে এই সম্মান দেখিয়েছেন। মধুসূদন কৃত্তিবাসকে কীর্তিবাস নামে উল্লেখ করে গেছেন। আজ আমরা কীর্তিবাস কবির যথার্থ মূল্য বুঝতে শিখেছি।

●

উপযুক্ত ব্যক্তির মূল্য আমরা বুঝতে শিখেছি ব'লেই আজ সবুজ-পত্রের বীরবলকে নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হ'য়েছে। গত সংখ্যায় বীরবল সম্বন্ধে আমরা একটি প্রবন্ধ প্রকাশ ক'রেছিলাম। এবার বীরবলকে নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করতে চাই। বীরবলের পাঠক-সংখ্যা খুব বেশী নয়। তার কারণ অতি সহজ। জমাট পদার্থ থেকে আমরা তফাতে স'রে থাকতে চাই, আমরা এতই তরল। যে-বিষয় পড়তে চিন্তা ও চেষ্টা থাকা দরকার, আমাদের দেশের পাঠকদের মধ্যে বেশির ভাগই তা পড়তে নারাজ। প্রমাণ, ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের বহুল প্রচার, প্রমথ চৌধুরীর পাঠকসংখ্যার ন্যূনতা।

আমাদের দেশে সিনেমা-সাহিত্য নামে একপ্রকার অভিনব পদার্থের আবিষ্কার হ'য়েছে। অনতিবিলম্বে সোফার-সাহিত্য নামক নবতম আবিষ্কারের আশায় বসে আছি। যারা প্রাইভেট মোটরগাড়ী চালায়, তাদের অবসর অপর্যাপ্ত, মনিবকে পৌঁছে দিয়ে ঠায় তাকে ধর্না দিয়ে বসে থাকতে হয়—সে-সময় তার হাতে কিছু থাকা দরকার। এবং দেখাও গেছে, কিছু-না-কিছু তাদের হাতে থাকে। তারা ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে তা পড়ে। আমাদের প্রকাশকরা যদি এ-দিকে মন দেন্, তাহলে তাঁদের ব্যবসায় চলার আশা রাখি। এ-হেন পাঠকবহুল প্রদেশে কেন-যে অন্যান্য বই চলেনা, বোঝা কঠিন। এই সিনেমা-সাহিত্য ও সোফার-সাহিত্যের দেশে যাঁদের বই চলেনা, আমরা তাঁদের কথা বলতে চাই। তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রমথ চৌধুরী।

●

প্রমথ চৌধুরীর অবস্থা অনেকটা রামায়ণের উর্মিলার মতো। উর্মিলাকে বাদ দিলে রামায়ণ পঙ্গু, প্রথম চৌধুরীকে বাদ দিলে বাঙলা সাহিত্য কাণা। কিন্তু রবীন্দ্র-জয়ন্তী শরৎ-বন্দনা ইত্যাদি করে আমরা নিঃশোষিত-শক্তি যদি না হ'য়ে থাকি, তাহ'লে অবিলম্বে প্রমথ চৌধুরীকে বরণ করার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রীযুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদ ও শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে ধন্যবাদ, তাঁরা এ-বিষয় সাড়া তুলেছেন। এ-সাড়ায় আমরা সাড়া দিতে প্রস্তুত।

●

শুভ নববর্ষে কবিগুরু যে-বাণী প্রচার ক'রেছেন, তা সময়োচিত এবং প্রণিধান যোগ্য। সেই বাণী থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত ক'রে আজ এ-প্রবন্ধ বন্ধ করলাম।

"ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ ক'রে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ ক'রে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হ'য়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হ'য়ে গেল।"

রবীন্দ্রনাথের ৮০ বৎসর বয়স পূর্ণ হ'লো, তাঁর এই দীর্ঘ জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার এ কেবল সহজ অভিব্যক্তি।

কয়েকটি অভিমত

শ্রীযুক্ত সুশীল রায়

নাচঘর সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

বন্ধ নাচঘর আবার খোলা হ'য়েছে দেখে খুশী হলুম। নতুন নাচঘরের উন্নতি দেখে কাগজে ছাপায় ও লেখায়। নৃত্য সম্বন্ধে— আমি বিশেষজ্ঞ নই, তাহলেও শ্রীযুক্ত বিনয় দত্তের প্রবন্ধটি ভাল লাগল। লেখাটি পরিষ্কার—আর তার ভাষা সরল। তাঁর মতামতের সঙ্গে আমি যে একমত তা অবশ্য নয়। লৌকিক নৃত্য—আর যে নৃত্যকে artistic নৃত্য বলে এক জিনিষ নয়। আর খুব ভাল লেগেছে শ্রীমান সৌরীন্দ্র মিত্রের লেখা। আমার প্রশংসা আছে বলে নয়। লেখক মাত্রই প্রশংসালোলুপ। তাহলেও সব প্রশংসাই আমাদের মুগ্ধ করে না। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র মিত্রের লেখা চমৎকার। আমার বিশ্বাস ইনি ক্রমে একজন খুব বড় লেখক হবেন।

আশা করি নাচঘরের এ উন্নতি চিরস্থায়ী হবে। জানি যে—বর্ত্তমানে, কোন বস্তুর আয়ু আছে—আর কোন বস্তুর তা নেই বলা অসম্ভব।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

24-2-41.

দেশ—১লা মার্চ ১৯৪১, ১৭ই ফাল্গুন ১৩৪৭

আলোচ্য পত্রিকা খানি দীর্ঘ ১২ বৎসর গৌরবের সহিত প্রকাশিত হইবার পর কিছু কাল লুপ্ত হইয়াছিল। গত মাঘী-পূর্ণিমায় পুনরায় তাহা নানা প্রবন্ধ গল্প ও চিত্র সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি নির্ভীক প্রকাশভঙ্গি ও গঠন মূলক মতবাদ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। শিল্পকলা, সাহিত্য, নৃত্যকলা, সঙ্গীত ও সিনেমা প্রসঙ্গে আলোচনা গুলি প্রণিধানযোগ্য। কবিতা গুলি সুখপাঠ্য। শিল্প ও সাহিত্যানুরাগী মাত্রই পত্রিকাখানি পাঠে আনন্দলাভ করিবেন ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

Advance (March 2nd, 1941)

Natchghar which was once the premier weekly of Bengal had been dead for some time under unavoidable circumstances. But the journal has again been revived in a monthly form under the able management of Sj. Dhiren Ghosh and the editing of the journal has been entrusted to Sj. Susil Roy, the eminent Bengali literature and journalist. The first issue of the journal which is under review has been a brilliant one.

Hindusthan Standard (Sunday, Feb. 23rd, 1941)
Natchghar (Bengali Monthly).

The present issue contains several interesting articles from the pen of good writers on various entertaining subjects. The number is profusely illustrated. We wish long life for the journal.

Amrita Bazar Patrika (Feb. 24th, 1941)
Natchghar Monthly.

It is really good news for the public that Natchghar the reputed Bengali weekly has been revived in the form of a monthly magazine under the management of Sj. Dhiren Ghosh and the Editorship of Sj. Susil Ray. The present issue of the journal in the new series has given entire satisfaction by virtue of its brilliant contributions, get up and printing.

নাচঘর

সুশীল রায়, সম্পাদক

গোপাল ভৌমিক, সহঃ-সম্পাদক | ধীরেন ঘোষ, পরিচালক

ত্রয়োদশ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮ { তৃতীয় সংখ্যা

নিয়মাবলী

১। মাঘ মাস থেকে নাচঘরের বর্ষারম্ভ ;

২। প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহে নাচঘর প্রকাশিত হয় ;

৩। প্রতি সংখ্যার নগদ দাম চার আনা, বার্ষিক সডাক তিন টাকা চার আনা ;

৪। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, সমাজ, ধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ এবং মৌলিক ও অনুবাদ গল্প উপন্যাস একাঙ্ক-নাটক কবিতা প্রভৃতি রচনা নাচঘরে সাগ্রহে গৃহীত হয় ;

৫। উপযুক্ত ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয় ;

৬। রচনাদি সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য।

বিজ্ঞাপনের হার

কার্যালয়ঃ

৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টেলিফোন : কলিকাতা ৩১৪৫

টেলিগ্রাম : রিদম্‌স্ (Rhythms)

সূচীপত্র

লেখ্য-সূচী

চিত্র-সূচী

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রবিনোদ সিংহ

বুদ্ধিবৃত্তির মাপকাঠিতে বিচার করলে সাহিত্য যেখানে এসে বিশ্বসাহিত্যের কোঠায় পৌঁছায়, রবীন্দ্রসাহিত্য সে স্তর ছাপিয়ে উঠেছে। নিজের দেশকে, জাতিকে ভিত্তি করে যে সাহিত্য গড়ে উঠবার প্রয়াস পেয়েছিল, তা আজ দেশ, কাল, পাত্রকে পশ্চাতে ফেলে বলগাহীন গতিতে, সাবলীল ভঙ্গীতে সাগর জলে ভেসে ভেসে সারা দুনিয়ার ঘাটে ঘাটে সঞ্চরণ কর্চ্ছে। এই প্রাণবন্ত সঞ্চরণশীল সাহিত্যসম্ভার মনুষ্য জীবনের বিচিত্র রস পরিবেশন কর্চ্ছে। শিল্প, সঙ্গীত, দর্শন, কাব্যানুভূতি, কথাচিত্র, সমাজনীতির স্তরভেদ, জাতীয়তার পূর্ণাঙ্গ ইঙ্গিত, এমন কি জাগতিক কর্ম্মপ্রবাহের চিন্তাধারা—এর কোনটিই রবীন্দ্র-সাহিত্যে বাদ পড়েনি। এ যেন একটা বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার সাধনলব্ধ জীবন্ত পরিণতি—দুর্নিবার গতি স্পর্শে আদর্শ-বাদের ছাঁচে ঢালা অনিবার্য্য বাস্তব একটা প্রতিচ্ছবি।

ভারতবর্ষের প্রাচীন পটভূমিতে অনুর্ব্বর মনোজগতে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও আত্মপ্রকাশ যেমনি অদ্ভুত তেমনি শ্লাঘ্য। ভৌগলিক ভারতবর্ষের হিমালয়কে রবীন্দ্রনাথের সংগে তুলনা করা যেতে পারে। হিমালয়ের প্রস্তরীভূত তুষার শীর্ষে যে প্রবাহ জন্ম নিয়ে সারা ভারতের নদ নদী মাঠ উর্ব্বর করে দিয়েছে, রবীন্দ্রসাহিত্য তেমনি রসধারা নিয়ে ভারতীয় জাতীয় আকাঙ্ক্ষার ক্রীড়াক্ষেত্রকে ফলবান পরিণতির দিকে এগিয়ে দিয়েছে। এটা আমাদের গৌরব, যে কোন জাতির গৌরব। আশী বৎসর পূর্ণ হল রবীন্দ্রনাথের—রবীন্দ্রনাথ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবিত কবি। সারা দুনিয়ার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও বলি—'কবি, শতং জীব।'

অনেকে বলেন, রবীন্দ্রনাথ মাটীর মানুষের কবি নন্, তিনি আকাশের কবি, কল্পনায় রঙীন্ অশ্ব ছুটিয়ে দিক্‌বিজয়ে মাতোয়ারা কবি। এ-কথা সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারিনে। তার কারণ, যদিও রবীন্দ্র সাহিত্য কল্পনাকে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে, সে ভিত্তিরও নীচে যে স্তর আছে, সেখানে বাস্তবতা ছাড়া আর কিছু নেই। বলতে পারা যায়, রবীন্দ্রসাহিত্য আদর্শবাদের ছাঁচে ঢালা বাস্তব রূপ। এ যেন সত্যিকার মাটী নয়, এ যেন সিমেণ্ট করা ঢালাই মাটী, সত্যিকারের মাটীর চেয়েও বড়। মাটীর গড়া বিচিত্র বিশ্বের ইতিহাস,

মানুষের জীবনের ইতিহাস। সেই মানুষকে আমরা দেখি রবীন্দ্রসাহিত্যের ধাপে ধাপে। স্তরক্ষেপে সে জীবনধারা কোথাও বা রঙীন হয়ে পড়েছে, কোথাও বা খাঁটী হয়ে পড়েছে। আঁধারে আলোতে মেশা এই যে কাব্যসৃষ্টি, এটাই তো জীবন দেবতার খাঁটি রূপ। যে রূপে রঙ্ নেই, সে আবার কিসের রূপ? তাইত বলি, রবীন্দ্রসাহিত্য রঙীন্ সাহিত্য, কল্পনার সাহিত্য, কিন্তু বাস্তবের পরিবেশে, সমাধানের ইঙ্গিতে, প্রেরণার প্রাখর্য্যে ঢালাই করা দৃঢ় সাহিত্য যেমনি রূপে, তেমনি কঠোরতায়।

ভোগের পৃথিবীতে অনুসন্ধান করতে করতে রবীন্দ্রনাথ সময় সময় হতাশ হয়েছেন। সব কিছু পাওয়ার উর্দ্ধেও যে আরেকটা পাওয়া আছে, তারই আশায় তাঁর কবি-মন সময় সময় ক্ষেপে উঠেছে। সেখানেই রবীন্দ্রবাদ রহস্যবাদের কোঠায় এসে পোঁছেচে। অসহ্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জীবনদেবতাকে খুঁজে খুঁজে কবি নিরাশ হয়ে বলেন—

আমি যাহা চাই ভুল করে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।

এই পাওয়া না পাওয়ার সন্ধিক্ষণে এসে কবি স্বর্গ এবং মর্ত্তকে এক সংগে দেখতে চান্। কবি জগতকে নিয়ে সুখী নন্, কিন্তু তাকে ছেড়ে যেতে চান্, তাও নয়। রহস্য-বাদকে পশ্চাতে রেখে আবার ভেসে উঠে বাস্তবতার ঢেউ এবং তারই তান মূর্চ্ছনায় কবি গেয়ে উঠেন—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

কবি মানবধর্ম্মী, মানুষের সুখ দুঃখের সংগে নিজেকে একীভূত করে রাখতে চান। সংসার ছেড়ে, গৃহকে ছেড়ে মানুষ বনে গিয়ে বাস করলে তখন সে আর মানুষ থাকে না। বিরাট বিশ্বের পথ বিপথে মানুষের চলার পথ বাধায় বাধায় দুর্গম, তাইত মানুষের চলমান শক্তির স্ফুরণ হয় সে বাধাকে অতিক্রম করায়। রবীন্দ্রনাথ সংসারী নন্, কিন্তু বন্ধনে তার অটল বিশ্বাস। তাই বলেন—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

রবীন্দ্রনাথের মন যেন সদাই বিবাগী, কিন্তু দেহ আছে গৃহের ক্লেদসিক্ত আঙিনায়। তাই তাঁর দেহ চলে মাটীর মানুষের মত, ক্ষুধায় জর্জ্জর, আশায় মশ্গুল—আর মন চলে রঙীন অশ্বে, দিক হ'তে দিগন্তরে কিসের খোঁজে যেন। মন চায় আদর্শবাদকে, কল্পনাকে—

আর দেহ চায় বাস্তববাদকে, পৃথিবীকে। তাই রবীন্দ্রনাথে দেখি সমান্তরাল দুধারা—বাস্তব আর অবাস্তব। এ দুয়ের আবার মিলন হয়েছে, সেও রবীন্দ্র-সাহিত্যে। বন্যা বাস্তবকে আঁকড়ে ধরে শোভনলালকে বিয়ে করে, আর আদর্শবাদকে মাথায় রাখে অমিত্‌কে মুক্তি দিয়ে, মুক্তি নিয়ে। কুমুর সমস্যা ত মাটীর সমস্যা, সৃষ্টির সমস্যা। আসল কথা, রবীন্দ্রনাথকে আদর্শবাদ আর বাস্তববাদের সীমারেখা দিয়ে বিচার করা ভুল। এ যেন একই শাখে দু'টি ফুল—একই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে, রস পাচ্ছে একই মাটীর পৃথিবী থেকে। দুধারী তরবারীর মত কেটে চলেছে রবীন্দ্রসাহিত্য—বাস্তব আর অবাস্তব।

রবীন্দ্রনাথ সমাজে রাষ্ট্রে দেখ্‌তে চান্ আমাদের ভারতীয় ভারতবর্ষকে যে, ভারতবর্ষ মৃগচর্ম্ম পেতে চতুষ্পথে বসে আছে কমণ্ডলু হাতে। হিলপরা তন্বীকে কালের ঝাপ্‌টা এসে উড়িয়ে নিয়ে যাক্, তা'তে কবির দুঃখ নেই, কিন্তু বেঁচে থাক অলক্তরাগ রঞ্জিতা দৃঢ়ভূজা ভারতীয় কন্যাটি, যা অনাদি কাল থেকে নিজের নিজস্বকে বিকিয়ে দেয়নি। রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ ঘুঙ্গুর পরে সভ্যতার ফ্যাকাশে রঙীন্ রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করে বেড়ায় না, সে ভারতবর্ষ নটী নয়— সে ভারতবর্ষ অন্যতর, 'ললাটে সিন্দুর বিন্দু, তাহে রাঙ্গা রবি জ্বলে', বেনারসী পরা,—সেবায়, পূজায়, শিক্ষায়, ত্যাগে মহিয়সী—অথচ সে হবে আধুনিকতম। ঐখানেই ত সমাজ ধূরন্ধরদের ধাঁধাঁ লাগে। পাশ্চাত্যকে বাদ না দিয়ে কেমন করে ভারতীয় ভারতবর্ষ গড়ে উঠবে, সে কথা এরা বোঝে না, গোঁড়ামী করে। রবীন্দ্রনাথ তাই সমাজ-হিতৈষণায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনরূপী। বিলেতী ফুলগাছ ভারতীয় বাগানে সাজাতে দোষ নেই, কিন্তু দেশী টবে, গঙ্গার জলে। দেশী টবে টেম্‌স্ নদীর জল দিয়ে বিজাতীয় ফুলগাছ বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করলে আর যাই হোক, সেটা জাতের বাঁচা হ'লো না। বাঁচ্‌তেই যদি হয় তবে জাতে বাঁচবো। দেশাত্মবোধে রবীন্দ্রনাথ যেমনি গোঁড়া, তেমনি উদার।

রবীন্দ্রনাথ বাংলাকে ভালবাসেন, ভারতবর্ষকে ভালবাসেন, বিশ্বভারতীকে ভালবাসেন। দূর থেকে Wordsworthএর মত ভালবেসে নয়, বুকে বুক রেখে আলিঙ্গন করে। এই দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ Wordsworthএর চেয়ে অনেক বড় জাতীয় কবি।

ধর্ম্মে রবীন্দ্রনাথ আত্মকেন্দ্রীক, নিজের মানবাত্মাকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়া রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম নয়। মানুষকে মানুষের মত গ্রহণ করার ভেতর মানুষের যে চিরন্তন এবং শাশ্বত একটা ইচ্ছা আছে, তাকেই অজানার অনুসন্ধিৎসায় নিয়োজিত করার নামই ধর্ম্ম। রবীন্দ্রনাথের

ধর্ম্ম মুখ্যতঃ মননে, কর্ম্মেই তা'র ছায়াপাত। বিচিত্র সুরে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বীণা ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে, ধর্ম্মে, জ্ঞানে, মননে, নানা দিকে।

রবীন্দ্রনাথ অফুরন্ত। এক বন্ধু বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ একটী মূর্ত্তিমান রূপকথা। আদিকবি বাল্মীকিকে আমরা বুঝি, কিন্তু জানিনা—রবীন্দ্রনাথ কালের কবি হয়ে মহাকালের সংগে মিশে গেছেন আমরা তাঁকে বুঝি, জানি। রবীন্দ্রনাথ ক্ষণজন্মা পুরুষ, জাতির ভাগ্যে এমন করে বারে বারে আসেন না এঁরা।

শান্তিবাদী অথচ জাতীয়তায় বিদ্রোহবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব 'কাল্ট্' দিয়ে জগতকে মুগ্ধ করেছেন, এ কথা ঐতিহাসিক সভ্যতার পুরোভাগে চিরদিন জ্বল্ জ্বল্ করবে, সে কথা পরাধীন ভারতও গৌরবের সংগে বলবার স্পর্দ্ধা রাখে। সারা বিশ্বময় আজ অগ্নি-অশ্ব উন্মাদ হ'য়ে উঠেছে, নাগিনীরা চারদিকে ফোঁস্ ফোঁস্ করে বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেল্‌ছে, এ যেন এক মহাতাণ্ডব। অশীতিপর বৃদ্ধ বেদের কবি ভারতীয় রবীন্দ্রনাথ একবার তাঁর 'শ্যামলী' থেকে বেরিয়ে এসে বলবেন কি, সম্বর! সম্বর! আর মানুষ কবি সংগে সংগে গেয়ে উঠবেন—

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধূলার তলে।

বঙ্কিম সাহিত্যে নারীর আদর্শ

গায়ত্রী রায়

বঙ্কিমচন্দ্র খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু নিজে তিনি ঔপন্যাসিক অপেক্ষা লোকশিক্ষকের আসনই বেশী কামনা কোরেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসমাজের সম্মুখে নানাবিষয়ে নিজের মতানুযায়ী আদর্শ স্থাপন করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—তাই তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসই শিক্ষামূলক।

বঙ্কিমের যুগে ফরাসী দার্শনিক Comte (কোঁতে) বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজের মনে মহাপ্রভাব বিস্তার কোরেছিলেন। 'There were more Comtists in Bengal than in France.' কোঁতের মত 'The Substance of religion is culture' 'বৃত্তিনিচয়ের সুসামঞ্জস্যের সম্যক্ বিকাশই ধর্ম।'

বঙ্কিম Comteর নিরীশ্বরবাদকে গ্রহণ করেন নাই। কোঁতে-ধর্মের সঙ্গে গীতার ভক্তিতত্ত্ব মিলিয়ে তিনি এক নূতন ধর্মের সৃষ্টি কোরেছিলেন। তাঁর এই ধর্মের আদর্শ পুরুষ সর্ববিদ্যায় পারদর্শী শ্রীকৃষ্ণ। ধর্মতত্ত্বে তিনি আদর্শ ধর্মের ব্যাখ্যা কোরেছেন, কৃষ্ণচরিত্রে সমাজকে তিনি পুরুষের আদর্শ দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁর মনোমতো আদর্শ নারী তিনি কোথাও পান নাই। এই নারীর আদর্শ দেখানোর জন্যই 'দেবীচৌধুরাণী'র সৃষ্টি।

Comteর ধর্মতত্ত্ব অথবা অনুশীলনতত্ত্বকে বঙ্কিক প্রফুল্লর জীবনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দেখিয়েছেন এবং তাঁর মতে এই হচ্ছে নারিত্বের সর্বোচ্চ আদর্শ। কিন্তু বঙ্কিম এখানেই থামেন নি, তিনি প্রফুল্লকে চিরযুগের নারীজাতির চিরন্তন আদর্শ বলেছেন।

"আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন।............কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ তাই আবার আসিলাম—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

কিন্তু 'দেবীচৌধুরাণী'র মধ্যে নারীর যে রূপ বঙ্কিম এঁকেছেন, তা মোটেই মহিমায় উদ্ভাসিত নয়, তাই নারীর চিরন্তন আদর্শ হবার যোগ্যতাও প্রফুল্লর বিন্দুমাত্র নেই।

বঙ্কিমের সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলি বহুদিন থেকেই সমাজের শ্রদ্ধা অর্জন কোরেছে, কিন্তু

এ কথা সত্যি যে তাদের মধ্য দিয়ে নারীজীবনের পরিপূর্ণ রূপ ফুটে ওঠে নি। নারীর মাতৃস্নেহের বিষয়ে, এক 'সীতারাম' ছাড়া সব জায়গাতেই তিনি নির্বাক। নারীর গৃহিণীরূপ, তার অপরিসীম পতিপ্রেম বঙ্কিম দেখিয়েছেন, কিন্তু তার জননীরূপ, তার অতুলনীয় সন্তানস্নেহ বঙ্কিমের চোখে পড়েনি। প্রফুল্লর চরিত্রেও এই অসম্পূর্ণতা র'য়ে গেছে।

'দেবীচৌধুরাণী'তে বঙ্কিম এই তত্ত্বই প্রতিপাদন কোরতে চেয়েছেন যে—মেয়েদের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র অন্তঃপুরে। গৃহধর্মপালন ও আত্মীয়পরিজনের সেবাতেই তার জীবনের পরম সার্থকতা। বাইরের বৃহত্তর জগতের কর্মধারায় অংশ নেবার অধিকার তার নেই, না থাকাই মঙ্গল। বঙ্কিমের এই মতে নূতনত্ব বা অসাধারণত্ব কিছুই নেই। বহুদিন থেকেই আমাদের সমাজে মেয়েদের অধিকার সম্বন্ধে যে সব অন্যায় ধারণা চ'লে এসেছে, বঙ্কিম তাদেরই প্রতিধ্বনি কোরেছেন মাত্র। সংসারধর্মপালন মহৎ কাজ, কিন্তু তবু এ কথা মানতেই হবে যে, প্রতিভা ও যোগ্যতা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র সংসারের গণ্ডীর ভেতর নিজেকে আবদ্ধ কোরে রাখা শুধু জীবনের অবমাননা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ সত্য আজ ভালভাবেই প্রমাণিত হ'য়ে গেছে যে, মেয়েদের যোগ, মেয়েদের সহানুভূতি ছাড়া কোন কর্মপ্রচেষ্টাই সার্থক হ'তে পারেনা, তবু এই বিংশশতাব্দীতেও বঙ্কিমের মতের পোষকতা করবার লোকের অভাব আমাদের দেশে নেই, তার কারণ মিথ্যা এক আদর্শবাদের সৃষ্টি ক'রে মেয়েদের মনুষ্যত্বের অধিকারকে চিরকালই আমাদের দেশে খর্ব ক'রে রাখা হ'য়েছে।

বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে বঙ্কিম মেয়েদের পুরুষদের চেয়ে অনেকটা হীন বলেছেন। প্রফুল্লকে কাব্য, ব্যাকরণ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত কোরতে দেয়া হ'লো, কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিমতী হ'য়েও সাংখ্য, বেদান্ত ও ন্যায় পড়ার অধিকার তার হ'লোনা। এমন কি ধর্মসাধনার ক্ষেত্রেও পুরুষের সাহায্য ছাড়া চলার যোগ্যতা মেয়েদের নেই। তাই Miltonএর 'He for God and she for God in him' এই কথার প্রতিধ্বনি করে বঙ্কিম বলেছেন,—

"ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়-পিঞ্জরে পূরিতে পারি না। সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ। স্বামী আরও পরিষ্কাররূপে সান্ত। এইজন্য প্রেম পবিত্র হইলে স্বামী ঈশ্বর আরোহণের প্রধান সোপান। তাই হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা। অন্য সব সমাজ হিন্দু সমাজের কাছে এই অংশে নিকৃষ্ট।"

বাইরের জগতের সকল কর্মের সম্পূর্ণ উপযুক্ত কোরেও বঙ্কিম প্রফুল্লকে সংসারে ফিরিয়ে আনলেন। তার নিষ্কাম ধর্মশিক্ষা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হ'ল। অবশ্য সংসারে প্রবেশ ক'রে প্রফুল্ল সকলকে সুখী করেছিল। বঙ্কিম বলেছেন এ কাজে সে সফল হ'য়েছিল, "কেননা, প্রফুল্ল নিষ্কাম ধর্ম অভ্যাস করিয়াছিল"। কিন্তু সাংসারিক জীবনকে সুখের কোরতে হ'লে

নিষ্কাম ধর্মশিক্ষার কিম্বা ভগবদ্‌গীতা পড়বার খুব কিছু প্রয়োজনীয়তা আছে কি? এমন অনেক সুগৃহিণী আমাদের দেশে ছিলেন, ও এখনও আছেন, ভগবদ্‌গীতা না প'ড়েও যাঁরা কত সুখের সংসার গ'ড়ে তুলতে পেরেছেন, নিজেদের সেবাপরায়ণতার গুণে সকলকে সুখী ক'রেছেন। জীবনে দুর্দৈব উপস্থিত না হ'লে, প্রফুল্লও যে ব্রজেশ্বরের সংসারকে সুখের ক'রতে পারতো, নিষ্কাম ধর্মশিক্ষা না পেয়েও, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

প্রফুল্লর বিদ্যাশিক্ষাও এক হিসাবে ব্যর্থ হ'য়েছিল। বঙ্কিম ব'লেছেন, "সে যে অদ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায়ের শিষ্যা, নিজে পরম পণ্ডিত—এ কথা দূরে থাক, কেহ জানিল না যে তাহার অক্ষর পরিচয়ও আছে। গৃহধর্মে বিদ্যাপ্রকাশের প্রয়োজন নাই।…………… ………যেখানে বিদ্যাপ্রকাশের স্থান নহে, সেখানে যাহার বিদ্যা প্রকাশ পায়, সেই মূর্খ। যাহার বিদ্যা প্রকাশ পায় না সেই যথার্থ পণ্ডিত।" প্রফুল্লর পাণ্ডিত্য সংসারে প্রকাশ পায় নাই, এটা তার চরিত্রের নম্রতার পরিচয় দেয়। কিন্তু বিদ্যার আর একটা মস্ত বড়ো সার্থকতা আছে—বিদ্যাদানে, সে দিক্ দিয়ে তার শিক্ষা ব্যর্থ হ'য়েছিল বল্‌তেই হবে।

বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনযাত্রার সম্পূর্ণরূপে যোগ্য হয়েও প্রফুল্ল সাধারণ মেয়েদের মতো সাংসারিক সুখের প্রলোভন প্রতিরোধ করতে পারলো না। এর মধ্যে অলৌকিক মহিমার কিছুই নেই। চুরী ডাকাতি না ক'রেও প্রফুল্লর পক্ষে আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রে জীবনে সার্থকতা লাভ করা সম্ভবপর ছিল, কিন্তু সে তা পারেনি। এর জন্য শ্রদ্ধা তাকে করা চলে না। সংসারের বন্ধন কাটাতে পেরেছিলেন ব'লেই বুদ্ধ, চৈতন্য, জগতের বরেণ্য হ'য়েছেন। সাংসারিক সুখের মোহে আবার ফিরে এলে তাঁদের মহত্বের আর কতটুকু অবশিষ্ট থাকতো?

যাই হোক্ 'দেবীচৌধুরাণীর' মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নারীর আদর্শ গৃহিণীরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন, আদর্শ নারীর রূপ এ নয়। তবু একেই নারীর সর্বোচ্চ আদর্শ ব'লে আত্মপ্রসাদ অনুভব করার লোক আমাদের দেশে যথেষ্ট আছে। তাই মনে হয় শরৎচন্দ্রের অতি দুঃখের অতি বড়ো সত্য উক্তি।

"মেয়েমানুষকে আমরা শুধু মেয়ে কোরেই রেখেছি, মানুষ হ'তে দিইনি। স্বরাজের আগে তার প্রায়শ্চিত্ত দেশে হওয়া চাই।"

ঝড়

অনিলকুমার ভট্টাচার্য্য

সদ্য প্রকাশিত গল্পটিকে লইয়া অলস শিথিল মুহূর্ত্তে অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় গড়গড়ার ধুম্ররাশির সহিত মশগুল হইয়াছিলাম।

সম্পাদক-বন্ধু শুভ সংবাদ জানাইয়াছেন, গল্পটি নাকি পাঠকমহলে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে।

বন্ধুরাও বলিয়াছেন, গল্পটা বেশ জমেছে হে!—নিজের লেখা পড়িতে পড়িতে মনে হইল সুমিত্রা লেখনী মুখে যেন জীবন্ত হইয়া ফুটিয়াছে। যৌবনের যে কোন একটি দুর্লভ লগ্নের রঙিন রেখান্বিত কাহিনী অনুভূতির সজীব বর্ণে যেন সুনিপুণরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। নিজের লেখায় নিজেই তন্ময় হইয়া গেলাম।

ছুটির সকাল, ব্যস্ততার আধিক্য নাই।

তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া গড়গড়ার আমেজে অতীত লগ্নের সুমোহন লিপিকায় মন বেশ মশগুল হইয়া আছে।

সম্পাদক বন্ধু অনুরোধ জানাইয়াছেন আগামী সংখ্যায় আর একটি গল্প দিতে হইবে। পাঠক সমাজ নাকি আমার লেখার তারিফ্ করিয়াছে!

অতএব? অতএব কল্পনা চলিল বালাখানার সুগন্ধযুক্ত তামাকের ধোঁওয়ার সাথে সাথে। জীবনের অলিগলি ঘুরিয়া ফিরিয়া অনুসন্ধান চলিল কোন্ অনুভূতিকে রূপ দেওয়া যায়।

প্রেম? হ্যাঁ, প্রেমের কাহিনীই ভালো। দুঃখ নয়—দারিদ্র্য নয়—দৈনন্দিন জীবনের শতকোটি অভাব-অভিযোগ-অপমান-লাঞ্ছনার ভ্রূকুটি কুটিল মালিন্য নয়—শুধু রূপ আর বর্ণ আর বৈচিত্র্য!

চায়ের টেবিলে খানিকটা মশগুল হইয়া থাকা—ভারাক্রান্ত চিত্তের খানিকটা রঙিন অবকাশ বিলাস!—কিন্তু সাহিত্য কি শুধু তাহাই?

দূর হোক্ ছাই! আবার সেই বিচার বুদ্ধি, তার্কিক মতবাদ! মনের চিন্তাধারাকে পালটাইয়া লইলাম।

এই অর্দ্ধ-শায়িত দেহটাকে সম্পূর্ণরূপে সুকোমল শয্যা-অঙ্কে ডুবাইয়া দিলাম।

গৃহিণী পিত্রালয়ে—ঠাকুর আসিয়া বার তিনেক আহারের তাগিদ্ দিয়া গেল।

আর সুস্থ মনে চিন্তা করিবার অবকাশও মেলে না। ঠাকুরকে বলিলাম, খাবার ঢাকিয়া রাখিতে, প্রয়োজন মতন আমিই দেখিয়া শুনিয়া লইব।

গড়গড়ার নলটি মুখ হইতে পড়িয়া গেল। দক্ষিণের এক ঝলক মিষ্টি বাতাসে মনে লাগিল আবেগের দোলা!

সুমিত্রা আসিল।

তাহার এই আকস্মিক আগমনে মনে বিস্ময় জাগে। এমন অসময়ে এমনি ভাবে তাহার আগমন—এ যেন অবিশ্বাস্য! ভালো করিয়া দেখিলাম। কিন্তু না, ভুল তো হয় নাই। সুমিত্রা? হ্যাঁ সেই সুমিত্রা! কিন্তু তাহার কোলে ওকে? একটি শিশু!

অভ্যর্থনার ভাষা ভুলিয়া গেলাম। কণ্ঠ যেন ভাষাহীন হইয়া গেল, শত চেষ্টাতেও মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইয়া আসিল না।

পরনে তাহার অতি সাদাসিধা একখানি লালপাড় শাড়ী, অঙ্গে অলঙ্কারের বাহুল্য নাই, সাদা শাঁখার কোলে সরু দুই গাছি চুড়ি, কানে দুইটি লাল পাথর—অন্ধকারে বেশ স্পষ্টই যেন দেখা যাইতেছে।

দেহ-লাবণ্য আর পূর্ব্বের মতন নাই। মুখখানি শীর্ণ, নীল শিরা কয়েকটী স্পষ্টভাবে জাগিয়া আছে। চোখ দুটিতে গাঢ় ক্লান্তির অবসাদ কালি রেখা কিন্তু তাহা যেন ক্রোধে স্ফীত অভিমানে ব্যথিত!

সুমিত্রাই প্রথমে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল।

কোন বিনয় নয়, অপরিচয়ের শঙ্কা নয়—রাগত কণ্ঠেই সে বলিল—এসব কি হচ্ছে শুনি?

আমি আরও অবাক্ হইয়া গেলাম। কি আশ্চর্য্য! সুমিত্রা? সুমিত্রাকে তো এরূপ কঠোর কখনও দেখি নাই!

থতমত খাইয়া বলিলাম—সুমিত্রা এসো—দাঁড়িয়ে কেন? এখানে বস!

না, বসবার আমার সময় নেই মোটেই। দেখছো না ছেলে কোলে করেই ছুটে এসেছি! সংসারে এখনও সমস্ত কাজ রয়েছে বাকী।—আর তোমার এখানে বসে খোস গল্প করবার দিন এখন আর আমার নাই। আমি এসেছি শুধু জান্‌তে কাগজে পত্তরে এসব কি বাজে কথা লেখা হচ্ছে শুনি?

রুক্ষ কর্কশ কণ্ঠে সুমিত্রা কথাগুলি উচ্চারণ করিল। তাহার কাঠিন্যে আমি

প্রথমে হতবাক্ হইয়া গেলাম, পরে নিজেকে কিঞ্চিৎ সামলাইয়া লইয়া কহিলাম—কি তুমি বলছো, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না ?

তা বুঝবে কেন ? আর আমার সঙ্গে তোমার কোন বোঝা পড়া করার সম্পর্ক রাখতেও চাইনে। আমি শুধু বলতে এসেছি কাজ না থাকলেও দুনিয়াতে অকাজ করবারও যথেষ্ট পন্থা আছে। অলস মস্তিষ্কে পরের জীবনের পর্য্যালোচনা করার কি অধিকার তোমার আছে ? কি সব ছাই পাঁশ লিখেছো এবং তাই আবার কাগজে ছাপিয়ে আমাকে অপদস্থই বা কেন করছো ? সুমিত্রার কণ্ঠ ক্রোধে রুদ্ধ হইয়া গেল।

আমি বলিলাম, গোড়া থেকেই যদি তুমি ঝগড়া করার মনোবৃত্তি নিয়ে এসে থাকো তবে আর তোমার সঙ্গে কেমন করে তর্ক করবো বলো—আমার কথাই বা কেমন করে বোঝাব ? এতখানি পথ অতিক্রম করে এসেছো, রাগের মাথায় অসংলগ্ন বকে চলেছো—বসো—সুস্থ হও ! একটু চা খাবে ?

সুমিত্রা আরও চটিয়া উঠিল—বলেছি না, আমার অবকাশের বাহুল্য তোমার মতন নেই ! আমি শুধু জান্‌তে এসেছি এসব বাজে কথা লেখার কি অধিকার তোমার আছে ? আর আমার নামে যা তা কেনই বা ছেপেছো ?

আমি বলিলাম, সময় যদি না থাকে কিংবা ইচ্ছা যদি না থাকে তাহলে অবিশ্যি আমার কোন জোর নেই। তোমার অভিযোগের সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে আমরা স্রষ্টা, সংসারে যা দেখি সত্য—বাস্তব, আমাদের লেখনীমুখে তারই রূপ রূপায়িত হয়ে ওঠে ! আমি আমার অনুভূতিকেই শুধু রূপ দিয়েছি, তোমাকে আক্রমণ করার জন্যে আমি গল্প লিখিনি।

কিন্তু অপরের জীবন নিয়ে পর্য্যালোচনা করার কি অধিকার তোমাদের সাহিত্যিকদের আছে শুনি ?

তোমার কথার উত্তর আমি তো পূর্ব্বেই দিলুম সুমিত্রা। তুমি যদি এতে ব্যথা পেয়ে থাকো তার জন্যে ব্যক্তিগত ভাবে সত্যিই আমি দুঃখিত।

কিন্তু তোমার দৃষ্টি যে সত্যি, এমন কি প্রমাণ আছে ? তোমরা সাহিত্যিকরা পরের জীবনের কাহিনী নিয়ে যে বিষবাষ্প উদ্গীরণ করো তা যে সাহিত্য তারই বা কি যুক্তি আছে ? কতকগুলো ছাই পাঁশ অসার কথা লিখবে আর বল্‌বে অনুভূতি আর প্রেম, তারই বা কি অর্থ ? প্রেম কোথায় ?

সুমিত্রা যেন কাঁপিতে থাকে, তাহার ক্ষীণ দেহ উত্তেজনা বশে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল।

বাধা দিয়া আমি বলিলাম—দাঁড়াও সুমিত্রা ! একসঙ্গে অতগুলি কথা বল্‌লে

তর্কের খেই হারিয়ে যাবে—তোমার প্রশ্নের আর উত্তর দেওয়া হবে না। যা লেখা যায় তাই যে সাহিত্য হয় না, একথা খুবই মানি। প্রথমেই দেখতে হবে তা রসবান কিনা—আর্ট না থাক্‌লে তা কখনই সাহিত্য হতে পারে না। এখন আর্ট কি তাই সংক্ষেপে তোমায় বুঝিয়ে বলি শোন –

আর্ট-ধর্ম্ম সম্বন্ধে তোমার লেক্‌চার শুন্‌তে আমি আসিনি। আমি জানি এখনই তুমি তোতা পাখীর মতন কতকগুলো বুক্‌নি শোনাবে। আমার কথা হচ্ছে, তুমি যা লিখেছো তা অতি বাজে কথা এবং অতি মিথ্যে কথা! তোমার সময় আছে—কাগজ কলম আছে—সাংসারিক চিন্তাও বোধ হয় বেশী নেই—সম্পাদক-বন্ধু আছে—অতএব তুমি লিখ্‌বে। তা লেখ গে যাও! লোকের বাহবাতে আত্মপ্রসাদ অনুভব করো, তাতে আমার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নেই! কিন্তু লেখার ভেতর আমাকে টান্‌ছো কেন? আমি গৃহস্থের বধূ - ঘর সংসার স্বামী পুত্র, দুঃখ, দারিদ্র্য এই নিয়েই থাকি। প্রেম, ভালবাসা, পরকীয়া তত্ত্ব—এসবের কোন ধার ধারিনা! আমাকে গল্পের নায়িকা করে এমন সব আপত্তিকর মন্তব্য প্রকাশ করেছো কোন অধিকারে?

অসত্য কিছু তো বলিনি, সত্য প্রকাশও আর্টের ধর্ম্ম!

আবার সেই আর্ট! সব কলেজে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে। আর সত্য! কিসের সত্যি! আমি কি তোমাকে ভালোবাসি? না তুমি আমাকে ভালবাস? আমাদের ভালোবাসার মর্য্যাদা কোথায়? আমি আজ পরস্ত্রী—ঘর সংসার, স্বামী, পুত্র, আত্মীয় পরিজন, সমাজ এই নিয়ে বাস করছি। আর তুমিও নব বিবাহিতা পত্নীকে নতুন করে কাব্য বন্দনা সুরু করেছো—ভালোবাসা কোথায় রইল শুনি?

সামাজিক বিধান অনুসারে আমরা পরস্পরে সামাজিক বন্ধনে জড়িত হতে পারলুম না—কিন্তু তাই ব'লে তোমার প্রতি আমার অনুরাগ আমার ভালোবাসার পবিত্রতার শৈথিল্য ঘটেছে এমন কথাই বা কেমন করে সত্যি? আর তুমিও আমায়—

কথার মাঝখানেই সুমিত্রা তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাইল : কক্ষনোই না—তোমার কথা আমার মনেই আসেনা। তুমি আমার কে? কি সম্পর্ক তোমার সঙ্গে আমার? কৈশরের যৌবনের অনুরাগও অতি ঠুন্‌কো—ওর কোন গুরুত্বই নেই। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি! এ আমার অতি সৌভাগ্য! আমি কত সুখী জানো? আমার স্বামী—আমার সন্তান—আমার সংসার—

আঁচলে চোখ ঢাকা দিয়া সুমিত্রা ফুঁপাইয়া উঠিল। আবেগের আতিশয্যে সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। অন্তর-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরেও যেন ঝড় উঠিয়াছে।

মাটি কাঁপিতেছে—পৃথিবী কাঁপিতেছে—সুমিত্রার ক্ষীণ পদযুগল ঝড়ের আঘাতে

ছিন্নলতার ন্যায় এইবারে বুঝিবা ভাঙ্গিয়া পড়িবে। আত্মচেতনা বুঝি তাহার আর নাই।

কিন্তু না—সেই ঝড়ের মাঝেই সুমিত্রা ছুটিয়া চলিল।

বাহিরে কালবৈশাখীর রুদ্র দেবতা ভীষণ গর্জ্জন করিয়া চলিয়াছে, সৃষ্টির মাঝে লাগিয়াছে রুদ্রের নাচন। মেঘ ডম্বরুর ভীতিপ্রদ হুঙ্কারে বিজলী চমকাইয়া উঠিতেছে। কড়কড় শব্দে কোথায় যেন বাজ পড়িল।

ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে আমি চিৎকার করিয়া উঠিলাম, সুমিত্রা—সুমিত্রা—

ঠাকুরের ডাকে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম।

জাগিয়া দেখিলাম—সত্যই সুমিত্রা চলিয়া গেছে।

বাহিরে কালবৈশাখীর ঝড় উঠিয়াছে।

সভ্যতা ?

অমল দত্ত

নদীর ঔৎকর্ষ গ্রাম বা বন্দরের অবস্থিতির উপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে মানুষের গ্রহণ কর্বার ক্ষমতার উপর। সূতোনুটি-গোবিন্দপুরকে কোলকাতায় পরিণত করার পিছনে যে প্রয়োজন ছিল, তা শুধু অর্থনৈতিক অভিযানের। মন্দির এবং মসজিদ প্রান্ত-বর্তিনী নদী বাসিফুল আর সাঁঝের পিদিম, ছিপ আর জেলে জাল, পতঙ্গা-কুসি-ময়ূরপঙ্খীর বহর পেরিয়ে থমকে দাঁড়ালো জেটির বাঁধনে। দূরদেশ-গামী জাহাজ আর বহুধনকামী ব্যবসা-দারের ভিড়। পাঁকে পাঁকে জমানো হাইড্রো-ইলেকট্রিক পেলে রূপান্তর বহুবর্ণ আলোক মালায়। আজ যদি গ্রাম বা বন্দর ভেঙ্গে নতুনতরো ব্যবস্থার প্রয়োজন পড়ে, তা হলে ভগীরথের মত শঙ্খনিনাদ চলবে না। সভ্যতা সম্বন্ধে আর নদীর উপমায় একথা বলা চলে।

নতুন ধুয়া উঠেছে : সভ্যতা ধ্বংসোন্মুখ। সত্যকে বিকৃত কোরে এ ধরণের চালবাজিতে স্বার্থের গন্ধ তীব্র কি না, বলা দুরূহ। ধুয়াধারীরা অন্তত কয়েকদিন সাম্প্রদায়িক নেতাগিরি চালাতে পারেন। তবে, তাঁরা সভ্যতার আওতায় আদপেই এসেছেন কি না খতিয়ে দেখা দরকার।

সভ্যতার ইতিহাসে সামাজিক ব্যবস্থার ওলোটপালোট চলছে। সঙ্গে সঙ্গে মান-বাণু নতুন বৃত্তের আকর্ষণে ক্রমাগত ছুটোছুটি করছে। আপন পরিমণ্ডলের মায়া এবং প্রয়োজনানুভূতি নবতরো সমাজ গঠনের পরিপোষক। মুস্কিল সেখানেই যাদের দ্বিধা সহজ পরিণতিকে অস্বীকার করে, এবং যারা কাকের মতো চোখ বুজে আপন দৌর্বল্য প্রখর আলোক থেকে আড়ালে রাখবার চেষ্টায় থাকে।

অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সামাজিক ব্যবস্থার পত্তনি। এই পত্তনি নীলামে উঠলে একটা বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের ক্ষতি হতে পারে মাত্র, যাদের স্বার্থ তাতে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কিন্তু তাতে বৃহত্তর সম্ভাবনা আছে। সম্ভাবনা আছে মানুষের সংঘশক্তির

বিকাশের এবং সভ্যতাকে উপলব্ধি কোরে অগ্রসারী প্রচেষ্টার। ধ্বংসোন্মুখ সামাজিক ব্যবস্থার লোলবক্ষে প্রতিপালিত ভীরুর বিকৃত চিন্তায় স্বার্থের সাফাই থাকাই স্বাভাবিক। পঞ্চদশ লুই ভগ্ন সিংহাসন থেকে নবজাগ্রত শক্তিকে অভিবাদন করতে পারেন নি। তাঁর কাছেও সভ্যতার মাপকাঠি ছিল: আফটার মি, দ্য ডেলুজ। কিন্তু সভ্যতার ইতিহাসে ফরাসীর দান শুধু মাত্র পঞ্চদশ লুই-এ সীমাবদ্ধ নয়। সীমাবদ্ধ নয় বরবোঁ রাজত্ব আর ন্যাপোলিয়নি খামখেয়ালিতে। বৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহাসিক পরিণতিতে অন্ধ অদূরদর্শী স্ট্যাটাস-কো-সেবীর কাছে আত্মবিলাপ এবং আত্মবিলাসই একমাত্র দার্শনিক আবিষ্কার। কিন্তু অপরিণত মনের আবিষ্কারি প্রতিভা সভ্যতার গতিরোধ করতে পারে না। যেমন চলে না টবের ঘেরে দেবদারুর সম্ভাষণ।

বুদ্ধিবৃত্তিকে দু'ইঞ্চি পুরু জাপানী পাউডারে ছুপিয়ে সস্তাবাজারে বাহবা মেলে বটে, কিন্তু, প্রাণ-চঞ্চলতাকে অস্বীকার করা চলে না। তা' হলে, তা হবে আত্মহত্যা। ঢিলাদার গিলাদার কেতাদুরস্ত কেতাবদুরস্ত দোআঁশলা সামাজিক ব্যবস্থায় উদ্ভূত ন্যুরটিক বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের কৃত্রিম মুখোস একদিন খসে পড়বে। কর্ম্মমুখর বন্দরে গিলাদারি ন্যাকামির স্থান নেই। ক্রেণের তলায় দাঁড়িয়ে উর্বশীর জন্যে প্রলাপ বচন আওড়ানো নিতান্তই হাস্যকর। সভ্যতার সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ সেদিন থেকেই নষ্ট হয়ে গেছে, যেদিন থেকে স্বপ্ন দেখবার উপযুক্ত পরিপার্শ্বিকতা আর মিলছে না। যৌনআবেশসঙ্কুল স্নায়বিক দৌর্বল্য এবং ক্লান্তি যখন পাহাড় প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন সম্মুখের চলমান মানবসমাজ তাদের পরিপ্রেক্ষণে আসতে পারে না, ঐতিহ্যের বড়াই শুধু চলে। এবং আত্মকেন্দ্রিক পরিকল্পনায় সভ্যতাকে খতম দিতে আর আপত্তি কী আছে।

কিন্তু অসুস্থ মনকে আর প্রাশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

সম্প্রতি বাংলা সাম্প্রতিক কবিতা সম্পর্কে দিল্লী থেকে একটি নতুন ফারমান জারী করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, দুটো লক্ষণের উপর সাম্প্রতিক কবিতার অভিব্যক্তি নির্ভর করে - দেখতে হবে যে, আমরা যে সভ্যতার বড়াই করি তা ধ্বংসোন্মুখ: প্রতি ছত্রে প্রকাশ পাবে য়ুরোপীয় সাহিত্যে গভীর পাণ্ডিত্য! তদুপরি দু'একজন ইংরেজ কবির প্রভাব যদি সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, ফারমানে আরো বলা হয়েছে যে, সে কবিতা প্রথমতম শ্রেণীর বলে গণ্য করা হবে। ফারমানে দু'জন কবির নাম, উদাহরণ স্বরূপ, উল্লেখ করে তাঁদেরকে অনুগৃহীত করা হয়েছে। জানিনা, অধ্যাপক হরিনাথ দে-র বাংলা রচনা প্রতিপৃষ্ঠা দু'ভাগ করে চিরে দেখালে,—নতুন ফারমানে তাঁকে কবি-শ্রেণীভুক্ত করা হতো কি না, এবং করলেই

বা কতহাজারী মনসবদারি তিনি পেতেন। অথবা অধ্যাপক বিনয় সরকার 'ফুজি তুই বুড়ী হয়েছিস' লিখেও কেনো যে অবজ্ঞাত রয়ে গেলেন, তা সম্যক উপলব্ধি করতে পাচ্ছি না। যাক, আমার কথা হলো প্রথম লক্ষন সম্বন্ধে : সভ্যতা ধ্বংসোম্মুখ।

প্রবল প্রতিভাশালী 'কবিতা'-সরকার বাহাদুরের দিল্লী-অনুশাসন অমান্য করবার মতো বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি আজ বাংলাদেশে দেখা দিয়েছে। চিন্তার রাজ্যে বাচ্চাইসাকোর স্থান অধিক দিন স্থায়ী নয়। তার ঐতিহাসিক প্রয়োজন শুধু আপন ভাওতায় সত্যকে তীব্র-তরো করবার। তারপর, আত্মঘাতী ক্ষমতার অবসান।—

চক্র

সুশীল রায়

মাগুরা না মুঙ্গের, কী যেন—
সেখানে তোমার বসবাস।
ব'লে গেলো কথায় কথায়
তোমাদের জ্ঞাতি কালিদাস॥

কম পক্ষে বছর পাঁচেক
কোনো খোঁজ পাইনি তোমার;
জলঙ্গী না প্রেমতলী ঘাটে
ছিলে জানি স্টেশন-মাস্টার॥

সে-চাকরি নিজের দোষে নাকি
হারিয়েছে তোমার স্বামীটি।
আজো নাকি শোনেন ঘুমিয়ে
ওই বাজে স্টিমারের সিটি॥

অদৃষ্টের কথা কেন বলো—
তুমি আজ প'ড়েছ নাচারে।
প্রেমে হ'লো কর্তব্যে গাফিলি
গেলো তাই চাকরিটা, বাছা রে॥

তাঁর নাকি নেশা এততেও
কাটেনি,—বলিল কালিদাস।
তোমার নীলিমা নাম নিয়ে
তাঁর নাকি তেমনি উচ্ছ্বাস॥

খালি পেটে প্রেম হয় নাকি?
কালিদাস হেসে বলে: 'হয়।'
প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত চাহিলে
তোমাদের দ্যাখাতো নিশ্চয়॥

প'ড়েছ গ্রহের ফেরে, বুঝি,
নিস্তারের পথ তো জানিনে !
তা না হ'লে নিজ-ব্যয়ে দু'টো
মাদুলীই পাঠাতেম কিনে ॥

নীলিমা, তার-চে' আজ থেকে
তোমার ও-নাম পাল্‌টাও—
মালিনী নামটা মন্দ না
উল্‌টিয়ে তা-ই ক'রে নাও ॥

ভাগ্য যদি তা'তে ওল্‌টায়
পরীক্ষাটা ক'রে ছাখা ভালো—
নাম ছাড়া যদি তোমার
সর্বাঙ্গই ভীষণ রসালো ॥

জীবনেতিহাস লিখবার
স্থান এটা কখনই নয়—
তা না হ'লে তোমাকে জড়িয়ে
দেওয়া যেত আত্ম-পরিচয় ॥

লিখিতাম অধ্যায়ে অধ্যায়ে
ধরা-ছোঁয়া আদপে না দিয়ে
এমন করুণ রূপ-কথা
গৌড়জনে দিতেম কাঁদিয়ে ॥

সব আজ মনেও পড়েনা,—
কম না তো; বছর পাঁচেক।
গেছে যেই মুখের গ্রাসটি
গেছে যেন ক্ষুধার উদ্রেক ॥

আমিও গ্রহের দোষে আছি
সে-ও প্রায় পাঁচটি বছর—
উপদেশ অনেক দিয়েছে
জ্যোতির্বিদ্‌ পণ্ডিত প্রবর ॥

শুধু তাই আঙটি বদ্‌লাই
ফল তো দেয় না একটাও!
তোমার ছুলের কোরালের
অনুরূপ প'রেছি পলা-ও ॥

কালিদাস জ্যোতির্বেদ ঘাঁটে
এ-সংবাদ আন্‌কোরা নূতন
ভবিষ্যৎ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি
বহুক্ষণ করিনু দু'জন ॥

অতীতের দু'চার ঘটনা
চক্র দেখে বলিল সে খাঁটি:
জাতকের হালের পাথর
অদৃষ্ট ক'রেছে তার মাটি ॥

আঁতের গোপন-কথা শুনে
হ'লো মোর অগাধ বিশ্বাস
ছাখা যাক্ কি করে এবার
তোমাদের জ্ঞাতি কালিদাস ॥

জুপিটার রুলিং প্ল্যানেট
আজো তাই টিকে আছি নাকি:
সে যেন ধ'রছে হাতে-নাতে
কোন্ খানে গ্রহের চালাকি ॥

অদৃষ্টের চাকা ঘোরাবই—
এ আমার সুকঠিন পণ
এর জন্যে প্রয়োজন যদি
দিয়ে দিতে রাজি এ-জীবন ॥

আমরা তো অন্ধ চামচিকে
কী-বা বুঝি অদৃষ্টের লীলা!
পোখরাজে, কালিদাস বলে,—
হবে না, আমার চাই নীলা ॥

প্রাকৃতিক

(উপন্যাস)

প্রথম খণ্ড : তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সরোজকুমার মজুমদার

বিস্ময়ে সুষমা পাথর হ'য়ে গিয়েছিলো। প্রকাশের অন্তর্ধানের আকস্মিকতার আঘাতে ও অভিভূত হ'য়ে গেল।

প্রকাশের চিঠিটা ওর হাত থেকে স্খলিত হ'য়ে লাল-সিমেণ্টের মেঝেতে প'ড়ে রয়েছে, সুষমা উঠলো। প্রকৃতিস্থ হ'তে ওর খানিকটা সময় ব্যয়িত হ'লো।

আরেকবার ও দাদার চিঠিটা প'ড়তে সুরু করলো,—প্রকাশ ওর জীবনের চলার পথে কোন বিঘ্ন রাখেনি; সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপার পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছে। লিখেচে, সবচে' নূতন যে স্যুটকেশটা সেদিন প্রকাশ কিনে এনেছেন তার মধ্যে আছে যতো প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র, দলিল, ইত্যাদি। লোহার সিন্দুকের মধ্যে নগদ টাকা আছে হাজার দুই। আর মা'র পুরানো গহনা। তক্তপোষের নীচে যে টীনের বাক্স আছে তার মধ্যে প্রকাশ সবগুলো চেক-বই রেখে দিয়েছে। সাদা চেকগুলো সমস্তই সই ক'রে রেখেচে। প্রয়োজন মতো সুষমা তারিখ দিয়ে টাকার পরিমাণ লিখে নিতে পারবে। ঠাকুর্দ্দার কেনা কোম্পানীর কাগজগুলো কোথায় আছে তা-ও প্রকাশ লিখতে ভোলেনি। পরিশেষে সুষমাকে অনেক উপদেশ দিয়েছে :—তোমার ওপরে আমার গভীর আস্থা আছে, সুষমা! আমি জানি, অন্যায় পথে তুমি কখনো চ'লবেনা, চলতে পারো না। কারণ, তোমার দাদার থেকে তুমি অনেক বেশী উন্নত ক'রেচো তোমার চরিত্র, একা খালি বাড়িতে থাকা তোমার ঠিক হবে না। যত তাড়াতাড়ি পারো হস্‌টেলে ভর্ত্তি হ'য়ে যেয়ো।

আমার জন্য চিন্তা ক'রে শরীর ও মন দু'টোরই অপচয় ক'রো না। মনে ক'রো, মা'র মতোই আমার আকস্মিক মৃত্যু ঘ'টেচে। শুধু এ-টুকু জেনে রেখো, তোমার কাছ থেকে দূরে থেকে আমিও খুব শান্তিতে থাকবো না।

তোমাকে আশীর্ব্বাদ করার স্পর্দ্ধা রাখি না। কায়মনে আমার স্রষ্টার নিকট প্রার্থনা করি, জীবনে সুখ যদি-বা না পাও, শান্তির অভাব যেন বোধ ক'রতে না-হয়। ইত্যাদি।

সুষমার দু'চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে কয়েক ফোঁটা উষ্ণ জল গাল বেয়ে মেঝেয় প'ড়লো। শান্তি! শান্তির চমৎকার সূত্রপাত হ'য়েচে। বাবাকে সে কথনো দেখেনি; অর্থাৎ বাবার স্মৃতি ওর মন থেকে একেবারে মুছে শাদা হ'য়ে গেছে। মা-কে হারালো এই সেদিন। সুনীল অভিমান ক'রে কোথায় যে গেল চ'লে তার কোন হদিস্-ই নেই। বাঁকী শুধু দাদা। দেবতার মতো তার দাদা, এমন কোমল, এমন স্নেহশীল ভাই-ও তার অদৃষ্টে সহ্য হ'লো না।

সুষমা বুঝতে পারে দাদার অন্তর্ধ্যানের কারণ মূলতঃ সে নিজেই। কি দরকার ছিলো তার দাদার ওপরে শাসন চালাতে! হাজার হোক্ পুরুষ মানুষ তো বটে! একটু আধটু বদ্-খেয়াল না-হয় তার ছিলই। সে কেন তা-তে উষ্মা প্রকাশ ক'রতে গেল। প্রতিজ্ঞা ক'রলেই বুঝি মানুষ একদিনে অতদিনের নেশা ছাড়তে পারে, না?

নিষ্ঠুর হাতে সুষমা নিজের মুখ চেপে ধ'রলো। অমন রূঢ় আর কটু কথা তা'র বলার কিছু মাত্র প্রয়োজন ছিল না। সে কি জানে না তা'র দাদা কত কোমল, কত অসহায়, সামান্য আঘাতেই দাদা কেমন বিচলিত হ'য়ে ওঠে? সুষমা ভাবতে পারে না এ-বাড়ীতে দাদা নেই, অথচ সে আছে, এ হ'তে পারে না। সে দাদাকে ফিরিয়ে আনবেই যে-ক'রে হোক্। প্রকাশ যদি বেঁচে থাকে তবে সুষমা তাকে টেনে আনবেই। নিজের সুখের জন্য সে দাদার টাকা নষ্ট ক'রবে না। দু-হাতে সে খরচ ক'রবে টাকা যতো আছে, তার কাছে দাদাকে তার চাই-ই।

প্রকাশের পড়ার টেবিলের দিকে সে এগিয়ে এলো। ছোট চৌকো আয়নাটা ও চিরুণী চিরুণীর দাঁতের মধ্যে কতকগুলো চুল। তিন ঘণ্টা আগেও হয়তো দাদা এই চিরুণী দি'য়ে মাথা আঁচড়িয়েছে। সুষমা পরম স্নেহে চিরুণীটা এপিঠ ওপিঠ ক'রে দেখতে লাগলো।

কাঁচের একটা বেসিন-এর মধ্যে কতগুলো সাবানের ফেনা ম'রে আছে; কামানোর ব্রুশ্, সেফ্‌টি খুর, ধোয়া হয়নি। কাল বিকেলেই দাদা শ্যেভ্ ক'রেছিলো, সুষমার ওগুলো একটু ধু'য়ে তুলে রাখারও সময় হয়নি। সত্যি, দাদার প্রতি সে কোন কর্ত্তব্যই পালন করেনি এতদিন। মা নেই, তা'র ওপরে যত্ন নেওয়া তার সব সময়ে উচিত ছিলো। নিজেই সে আমোদ-আহ্লাদ ক'রে বেরিয়েছে, এখন সুষমা বুঝতে পারছে কী ঘোর অনাস্থা সে দাদাকে দেখিয়েছে। প্রকাশের মাথা'র বালিশটার ওপরে যে ঝাড়নটা, সেটাতে তো রাজ্যের ময়লা জ'মে আছে।

হঠাৎ সুষমার মনে হ'লো প্রকাশ হ'য়তো ফিরে আসতেও পারে। আজই, চাই-কি এই মুহূর্ত্তেও সে আসতে পারে। হয়তো আর দু-মিনিট পরেই কলিং বেল্‌টা ক্রিং-ক্রিং ক'রে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠবে। সুষমা ত্রস্ত-পদে ছুটে যাবে দোর গোড়ায়। কপাট খুলতেই প্রকাশকে

দেখতে পাবে, পেয়েই ও দাদার বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়বে। কিন্তু কথা ব'লবে না, খাবে না, কিছু ক'রবেনা, দাদাকে সে পালিয়ে যাওয়ার মজাটা বেশ ভাল ক'রে টের পাইয়ে দেবে। দাদা তাকে নিরর্থক ভাবিয়ে তুলেছিলো যেমন তেমনি তার প্রতিশোধ সে তুলবে। অন্ততঃ দু-ঘণ্টা, পুরো দু-ঘণ্টা সে প্রকাশের সঙ্গে একটাও কথা ব'লবে না, ডাকলে সাড়া দেবে না।

একটা বিড়াল মিউ করে কেঁদে উঠতেই সুষমা চমকে উঠলো। প্রকাশের বিছানাটা পরিপাটি করে সুন্দর ভাবে পেতে রাখলো। দাদা তার নিশ্চয়ই আসবে আজ রাতেই, তাকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না। ড্রেসিং টেবিলের ওপরে প্রকাশের একটা পোস্ট-কার্ড সাইজের প্রতিকৃতি দাঁড় করানো আছে। সুষমা ধীর পদে এগিয়ে গিয়ে সেটা হাতে তুলে নিলো।

প্রকাশের ছবিটা বুকের কাছে নিয়ে ও নিজেকে ঠাণ্ডা মেঝেতে এলিয়ে দিলো। প্রকাশ ওর দিকে চেয়ে হাসছে। সুষমা ভ্রূ-দ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত ক'রলো। অর্থাৎ, আমাকে কাঁদিয়ে তোমার মুখে হাসি আসে? আশ্চর্য্য! ক্লান্তিতে সুষমার চোখ ভারী হয়ে এসেছে।

শীলা ব'ললো, সুষমা একটা গান করনা ভাই। পিয়ানোর কাছে গিয়ে সুষমা বসলো, গান করতে তার ভারী ভাল লাগছে। আবেগের সঙ্গে সে গান করলো, একটা দু-টো, তিনটে··· অনেক গুলো গান সে গেয়ে ফেললো। সুরের মূর্চ্ছনায় বাতাস থেকে থেকে আকুল ভাবে কেঁপে উঠছে। শীলাকে তো ও শুধু ছাড়বেনা—শীলাকে ভায়োলিন বাজাতে হ'লো। ভায়োলিনে শীলার হাত ভারী মিষ্টি।

সুষমা চা-র জোগাড় করার জন্যে ওঠার উদ্যোগ ক'রলো। বাধা দিয়ে শীলা ব'ললো, তোমার দাদা আসুন, তারপর হবে'খন এক সঙ্গেই।

সুষমা ব'ললো,—দাদা কী এখন আসবে? দশটার আগে নয়, এ তুমি জেনে রাখো।

শীলা পাখার স্যুইচটা সরিয়ে দিয়ে বললে, উহু, আমার সঙ্গে কাল থেকে কথা আছে সাড়ে আটটায় অ্যাপয়েন্টমেণ্ট্।

শীলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ব'ললে—দেখলে? বললুম। ঐ দেখ তোমার দাদা আসচেন।

সুষমা শীলার দৃষ্টি অনুসরণ করে রাস্তার দিকে চেয়ে দেখলে মেয়েদের ইস্কুলটার ঠিক সামনে দিয়ে প্রকাশ আসচে, হাতে কতগুলো ফুলের তোড়া—লাল, নীল, গোলাপী, সাদা, অনেক রং-এর ফুল।

বাহিরের দরজায় কে জোড়ে ধাক্কা দিচ্ছে। ঝক্ ঝক্ শব্দে সুষমার তন্দ্রা কেটে গেল। ধড়মড়িয়ে ও উঠে প'ড়লো। শাড়ীটাকে কোন রকমে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গেল। দরোজা খুলতেই শিবুর মা গালে হাত দিয়ে পুরু-ঠোঁট বেঁকিয়ে ব'ললে, কোতায়

ছিলে গা দিদিমণি ? ঘুমুচ্ছেলে বুঝি ? বাবা, তোমাদের কী ঘুম গো দিদিমণি এত বেলা ক'রে। ডেকে ডেকে আমার গলা কাঠ হয়ে গেল।

এ সব মন্তব্য কিন্তু সুষমার কানে গেল না,—ততক্ষণে ও নিজের ঘরে চলে এসেচে।

শিবুর মা বাসন-কোসন মেজে খানিক বাদে এসে ওকে প্রশ্ন ক'রলো, নাউটা আজ কুটি দিদিমণি ?

সুষমা রূঢ় ভাবে ব'ললো,– আজ তোমার কিছু ক'রতে হবে না শিবুর মা। তুমি বাড়ী যাও। সেই বিকালে এসো। আজ আমাদের (আমাদের ব'লতে সুষমার গলা সামান্য কেঁপে উঠলো) নেমন্তন্ন আছে এক জা'গায়।

আর সামান্য ছোট-খাটো দু-একটা কথা ব'লে শিবুর মা প্রস্থান করলো। রাস্তার থেকে তার স্বর ভেসে এলো,—কপাট খোলা রইলো গা, দিদিমণি, লাগিয়ে দাও।

এখন কী করা যায় ? প্রকাশের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া একেবারে অসম্ভব। সামান্য একটা চিঠি পেয়েই সে দাদাকে তার জীবন থেকে ছেঁটে ফেল্‌তে পারে না।

প্রকাশের সম্বন্ধে ও পুলিশে খবর দেবে, দেশের সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেবে, বেশ মোটা টাকার পুরস্কার ঘোষণা করবে প্রকাশকে খুঁজে দেওয়ার জন্যে।

কিন্তু এ ছাড়াও প্রাথমিক সন্ধানের আরও বহু পথ রয়েছে। সেগুলো সুষমা একা কী ক'রে পারবে, ওর এই বিপদ কালে। এই অসহায় মুহূর্ত্তে ও সবচে বেশী সাহায্য পেতে পারতো যার কাছে সেও আজ হাতের বাহিরে চলে গেছে। সত্যি, সুষমা ভাবতে পারে না, সুনীল ছাড়া আর কেউ জগতে আছে কি না. যে প্রকাশের সর্ব্বাধিক দরদী বন্ধু ছিল।

সুষমা একবার শীলাদের বাড়ীতে যাবে। শীলার বাবা ও শীলার দ দারা, এঁদের দিয়ে কিছু সাহায্য পাওয়া সম্ভব বৈকি !

এই তীক্ষ্ণ দুর্ঘটনার কথা ও শীলাকে কী-ভাবে ব'লবে তা আর ঠিক ক'রতে পারে না। শীলার জন্য ওর ভয়ানক কষ্ট হয়। সুষমাই কেবল জানে, শীলা দাদাকে কত গভীর ভাবে ভালবাসতো। শীলার ভালবাসা ছিল আন্তরিক। নারীর জীবনে মাত্র একজন পুরুষ ছাপ রেখে যেতে পারে। শীলার কাছে প্রকাশ ছিল তাই। প্রকাশের অবনতিতে শীলা আহত হ'য়েছে, ব্যথা পেয়েছে। কিন্তু প্রকাশের এই হীনতাকে এক দিকে যেমন সে বিন্দুমাত্রও ক্ষমা করেনি, তেমনিই, প্রকাশের প্রতি তার প্রেম একটুও ম্লান হয়নি। শীলার ভালবাসায় প্রাণ ছিল কিন্তু উচ্ছ্বাস ছিল না।

অন্তরের মধ্যে যে বিপ্লব সুরু হয়েচে তারই ফাঁকে সুষমা শালার সঙ্গে নিজেকে একটু ওজন করে নিলো।

সুষমা ভাবে, শীলাদের বাড়ীতেই এখন যাবে। বাক্স থেকে শাড়ী ব্লাউস্ বার করে নিলো। নাঃ, সে তার বেশ বদলাবে না। এখন তার প্রসাধন করারই সময় বৈ কি। পরনের শাড়ীটাকেই সুষমা একটু টেনেটুনে নিলো। চুলগুলো স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে আছে। এগুলোকে একটু আঁচড়ে শাসনে আনতে হবে। নইলে, এ-ভাবে পথ চলার বিপদ অনেক, জোড়া জোড়া অনেক গুলো চোখের দৃষ্টি তার উপরে এসে পড়বে।

সহজ বেশ সমাপন করে সব কটী ঘরেই ও তালা ঝুলিয়ে দিলো। ছাতাটি হাতে নিয়ে বড় রাস্তার উপরে এসে পড়লো।

বালীগঞ্জের ট্র্যাম্ শীগ্‌গীর পাওয়া অসীম সৌভাগ্যের কথা, সুষমা তা জানে। কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করেও যখন যতদূর চোখ যায় তার মধ্যে ট্র্যামের মাথার ডাণ্ডা-টাও দেখা গেল না, তখন ও বাড়ীর দিকে চল্‌তে সুরু ক'রলো। এত যখন বাধা তখন আর কাজ নেই শীলার বাসায় গিয়ে। শীলাই বরং একবার আসুক। সে শীলাকে সব কথা বুঝিয়ে ব'লবে। একটু হয়তো কান্না আসবে। প্রকাশের ঘরে বসে ওরা দুজনে প্রাণখুলে চোখের জল ফেলবে। দাদার ঘরে বসে কাঁদার মধ্যেও সার্থকতা আছে।

বৈঠকখানা ঘরের দরোজা খুলে সুষমা ভেতরে ঢুকলো। ছাতাটা নামিয়ে রেখে ঘরের সমস্তগুলি জানলা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ক'রে দিলো। অসহ্য গরম, পাখাটাও খুলে দিলে। তেজের শেষ সীমানা পর্য্যন্ত Regulator টেনে আনলো তবু উত্তাপ একটুও তরল হ'লো না। যে তাপ অন্তরের, বিদ্যুৎ কেন, পৃথিবীর কোন শক্তিই তার দাহ শীতল করতে পারে না, যদি-না তা নিজে থেকেই শীতল হয়।

টেলিফোনের রিসীভার তুলে ধ'রলো। নম্বর বলার কিছু পরেই কার সাড়া পাওয়া গেল। বললো,—আমি সুষমা কথা বলছি, কাকাবাবু নাকি ? ওঃ! শীলা বাড়ীতে আছে ? একটু দিন তো একবারটি।

গলাটা যেন ক্রমশঃ আটকে আসচে। সুষমা বার দুই কেশে গলা সাফ্ ক'রে নিলো। দেওয়ালের দিকে মার সঙ্গে একবার চোখাচোখি হয়ে গেল।—

—হ্যাঁ, শীলা ? আমি সুষমা।

তার বেয়ে বেয়ে কুর-কুর করে শীলার শান্ত [সুর গড়িয়ে এলো, —হ্যাঁ, কী খবর ? ভালো সব ?

—হ্যাঁ ! তুমি একবার এসো আমাদের এখানে।

—বিকেলে যাবো, চারটের সময়।

—উঁহু, এ বেলাই, ভয়ঙ্কর দরকার, বিশেষ জরুরী।

—আচ্ছা, চা-টা খেয়েই আস্‌চি।

—নাঃ নাঃ! এক্ষুনি এসো, চা আমাদের এখানেই হবে। যেমন আছো, তেমনিই চ'লে এসো। এক মুহূর্ত্ত দেরী ক'রো না।

—কেন? কী ব্যাপার? খুলেই বলো না ভাই। তোমার দাদার কী—

—না, নাঃ! দাদার কথা নয়। এমনি, সে অন্য ব্যাপার, এলেই জানবে। এক্ষুনি এসো।

—আচ্ছা, আমি এই পোঁছোলাম ব'লে।

—কতক্ষণে তোমাকে আশা ক'রবো? বিশ মিনিট?

—না, আধ-ঘন্টা।　　　　(ক্রমশ)

রুশ-থিয়েটার

বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বর্ত্তমান যুগে সিনেমার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের আদর অনেকটা কমিয়া গিয়াছে একথা যাঁহারা বলেন তাঁহাদের ধারণা ভুল। কেননা নাটক ও সিনেমার আকর্ষণ পৃথক রকমের, একটির সহিত আর একটির প্রতিযোগিতার কোন কারণ নাই। আর্ট হিসাবে নাটকের উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। রুশ রঙ্গমঞ্চের দিকে চাহিলেই আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট হইবে।

একমাত্র লেনিনগ্রাডে কতগুলি থিয়েটার সমানভাবে চলিতেছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। সেখানে বালক বালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রেণীর দর্শকের জন্যই আলাদা আলাদা প্রেক্ষাগৃহ আছে, এবং প্রতিটি প্রেক্ষাগৃহে নূতন নূতন নাটক অভিনীত হইতেছে। জীবনকে উপভোগ্য করিবার জন্য তথাকার থিয়েটার-কর্তৃপক্ষ সত্যই অসাধ্য সাধন করিতেছেন। কেন তাহাই বলিতেছি।

আগে লেনিনগ্রাডে যে-দুইটি নাম-করা থিয়েটার ছিল তাহাদের নাম মারিন্স্কি ও মিখাইলভ্‌স্কি, এই দুইটিকে ভাঙিয়া 'স্টেট থিয়েটার অফ্‌ অপেরা অ্যাণ্ড ব্যালে' এবং 'লিট্‌ল অপেরা থিয়েটার' নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রথমটিতে উচ্চাঙ্গের নাটকের অভিনয় হয়। 'মস্কো বলশোই অপেরা'ও উচ্চাঙ্গের নাটকের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু উহার অপেক্ষা লেনিনগ্রাডের স্টেট থিয়েটার রুশ দর্শকের দৃষ্টি বেশি করিয়া আকর্ষণ করিয়াছে। অনেকদিন আগে 'ফ্রেম অফ্‌ প্যারিস' নাটকটি দুই জায়গাতেই অভিনীত হয়, কিন্তু স্টেট থিয়েটারেই ইহার অভিনয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলিয়া বিবেচিত হয়। এখানকার আর একটি নাটকের কথাও চিরদিন সকলের মনে থাকিবে, সেটি 'দি ফাউণ্টেন'। ইহার গল্পটি খুব সাধারণ—তাতার প্রদেশের কোন রুশ শাসন কর্ত্তার একটী সুন্দরী কন্যা ছিল, তাতারদের হাতে মেয়েটি বন্দী হয়। তাতারদের সর্দ্দার মেয়েটির প্রেমে পড়ে, কিন্তু আপন লোকের সঙ্গ না পাওয়ার ফলে রুশ মেয়ে ধীরে ধীরে মারা যায়। তাতার সর্দ্দার তাহার স্মৃতি রক্ষার্থে একটি স্তম্ভ ও একটি ঝরণা নির্ম্মাণ করে। নৃত্য ও সঙ্গীতের সাহায্যে নাটকটি এত সুন্দরভাবে

অভিনয় করা হইয়াছিল যে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এখানে নাটকের অভিব্যক্তির জন্য নৃত্যকলাকে একটি নূতন রূপ দেওয়া হইয়াছে।

'লিটল অপেরা থিয়েটার' সম্পূর্ণ অন্য রকমের ; স্টেট্ থিয়েটার যে পরিমাণে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ইহা সেই পরিমাণে হাল্কা। এখানকার নৃত্যও অন্য রকমের— উজ্জ্বল এবং মুখর। এখানে 'কপেলিয়া' নামক একটি নাটকের অভিনয় সকলকে বিশেষ মুগ্ধ করিয়াছিল।

আগেকার 'ইম্পেরিয়াল হারমিটেজ' থিয়েটারটি এখন 'সঙ্গীত বিভাগে' পরিণত হইয়াছে। ইহার ভিতর ও বাহির দেখিবার জিনিষ ; তাহা ছাড়া এখানে নাটক ও সঙ্গীত সম্বন্ধে সত্যই অভিনব চর্চ্চা চলিতেছে।

'আলেকজান্দ্রিস্কি'র নাম সর্বজন পরিচিত, বর্ত্তমানে ইহার নূতন নাম হইয়াছে 'স্টেট থিয়েটার অফ ড্রামা'। মেয়ারহোল্ডের প্রযোজনায় এখানে 'মাস্কোয়েরাড' নামক নাটকটির অভিনয় যে পরিমাণ দর্শকের মন আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। সোভিয়েট থিয়েটার সম্বন্ধে যাহার এতটুকু উৎসাহ আছে এই নাটকটি না দেখা তাহার পক্ষে লজ্জার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়। এই নাটকটির দৃশ্যাবলীর ঔজ্জ্বল্য প্রায় ইতিহাস প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। প্রযোজক হিসাবে মেয়ারহোল্ড সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

এখানে গোর্কী, ইবসেন প্রভৃতির নাম-করা নাটকগুলির অভিনয় হইয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে, দৃশ্য টেক্‌নিক ভাব—সকল দিক দিয়াই যাহাতে এই থিয়েটারটি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে কর্ত্তৃপক্ষের সে দিকে চেষ্টার ত্রুটি নাই। একমাত্র এই থিয়েটারই চার পাঁচ বৎসরের জন্য প্রোগ্রাম ঠিক করে, এবং তদনুসারে নির্দ্দিষ্ট তারিখে অভিনয়ের ব্যবস্থা করে। ব্যাপারটি খুব মজার। কোন্‌দিন কোন্ নাটকের অভিনয় হইবে তাহার তালিকা সকলের কাছেই থাকে, এজন্য খবরের কাগজ বা পোস্টার হাতড়াইতে হয় না। এরূপ সুনির্দ্দিষ্ট একটি কর্ম্মপন্থা আর কোন দেশের কোন থিয়েটারের আছে বলিয়া জানা যায় নাই।

'দি গ্র্যাণ্ড ড্রামাটিক থিয়েটার'ও নিয়মিত নূতন নূতন ধরণের নাটকের অভিনয় করিতেছে। এখানে এক কালে গোর্কীর নাটকগুলির অভিনয় সত্যই উপভোগ্য হইয়াছিল।

লেনিনগ্রাডের 'কমেডি থিয়েটারের' নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে নানা জাতীয় হাস্যরসাত্মক নাটক অভিনীত হয়। অন্যান্য দেশের ভাল ভাল হাস্যরসাত্মক নাটকের অভিনয়ের বন্দোবস্তও এখানে আছে।

ইহা ছাড়া লেনিনগ্রাডে ছোট ছোট কত যে থিয়েটার ও নাট্যসমিতি আছে তাহার হিসাব দেওয়া কঠিন। ইহাদের মধ্যে 'নিউ থিয়েটার', 'রেড্ থিয়েটার', 'ট্রেড